অগ্নিযুগের নায়ক

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৬৭

প্রকাশক .
কল্যাণব্রত দত্ত
১, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
সুশীলকুমার গোস্বামী
মহাপ্রভু প্রেস
১৫, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
জহর দাস

পাঁচ টাকা

বাংলার বিপ্লবী তরুণদের উদ্দেশ্যে

এই লেখকের

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ
স্বামী বিবেকানন্দ
পদ্মাবতী জয়দেব
গৌরপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া
বিদ্যাসাগর মাতা ভগবতী
চিত্রলেখা
ইত্যাদি

স্মরণীয় একটি দিন ১৫ই আগষ্ট। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। ইংরেজরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল বিলেতে। যেতে বাধ্য হল ভারতবর্ষের বীর সৈনিকদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে। ভয় পেল তারা, মুক্তি সংগ্রামীদের জীবন-মরন সংগ্রামে তাবা জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ করল।

এমনি আর একটি ১৫ই আগষ্টে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন বাংলার বীর সৈনিক অরবিন্দ। ভারতবর্ষের এক মহাসঙ্কটকালে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম। ইংরেজবা তখন দোর্দণ্ড প্রতাপে এই মহাদেশ সদৃশ বিরাট দেশের প্রভুত্ব করছে। ভারতবাসীদেব তাদের অনুকরণ করতে শিক্ষা দিচ্ছে। স্বাধীনতার যে কি স্বাদ তা ভুলিয়ে দিচ্ছে।

এই শতাব্দীতে ভারতের বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় প্রভৃতি সকল বিষয়ে বিরাট পরিবর্তন আসে। পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া লেগেছে ভারতীয় নৌকার পালে। নাবিকরা সেই নতুন হাওয়ার মৃদুমন্দ পরশ পেয়ে পুলক বোধ করছে। তার ওপর আছে চোখ ঝলসানো আপাত মনোরম জড়বিজ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ। প্রয়োজন নেই ভারতের ধর্মকেন্দ্রিক সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষা-দীক্ষাহীন দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবেশে বসবাস করার। তাই তারা ইংরাজীয়ানার দাস হয়ে এমনভাবে জীবন কাটাতে আরম্ভ করলো যাতে মনে হলো তারা ভারতীয়ও নয় আবার ইংরেজও নয়। এই দুইয়ের মধ্যে একটা কিম্ভূতকিমাকার শঙ্কর জাতি। কিন্তু এইভাবে একটি জাতি কখনো বড় হতে পারে না—এ জাতির বিলুপ্তি অবধারিত। অথচ ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ।

অরবিন্দের পিতার নাম কৃষ্ণধন ঘোষ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম আই. এম. এস. ডাক্তার। কে. ডি ঘোষ বলে লোকে একডাকে চিনতো। তিনি সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। এই প্রতিভাবান ছেলেটিকে খুব স্নেহ করতেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। তিনি তাঁর প্রথমা কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

ঋষি রাজনারায়ণ ছিলেন জাতীয়তাবাদের কবি। তিনি মনে করতেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্ম জ্ঞানকে বিসর্জন দিয়ে নয়।

বিয়ের পর বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফিরে এলেন পুরাদস্তুর সাহেব কৃষ্ণধন হয়ে। বাড়ির আসবাবপত্র আদবকায়দায় ইংরেজীআনার ছাপ।

স্বচ্ছল সুখের সংসার। পাঁচটি সন্তানের জনক। চার পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম—বিনয়কুমাব, দ্বিতীয়—মনোমোহন, তৃতীয় অরবিন্দ, চতুর্থ কন্যা সরোজিনী ও বারীন্দ্র জন্মগ্রহণ কবেনি তখনও।

পুত্রদের পুবাদস্তুব সাহেব করে গড়ে তোলবাব জন্য কৃষ্ণধন চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। বিনয়কুমার ও মনোমোহনের জন্য একজন ইংরেজ অধ্যাপককে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। অববিন্দের শিক্ষার ভার দিলেন একজন ইংরেজ মহিলার উপর। মহিলাটি কর্তব্য পালনে ত্রুটি করলেন না।

অরবিন্দের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁকে দার্জিলিংয়েব লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু শুধু স্কুলে ভর্তি করেই ক্ষান্ত হলেন না কৃষ্ণধন। ছেলে যাতে সাহেবী কায়দা-কানুন পুরোপুবিভাবে রপ্ত করতে পারে তার জন্য একজন ইউবোপীয়ান সাহেবের হেপাজতে রাখলেন অরবিন্দকে।

এই সময় স্ত্রী স্বর্ণলতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি নেই কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। উন্মাদের লক্ষণ দেখা

দিল। তিনি তখন লণ্ডনে নিয়ে যেয়ে স্ত্রীর চিকিৎসার সঙ্কল্প করলেন। তিনি আর একটা বিষয় চিন্তা করলেন, লণ্ডনে থাকলে ছেলেদের সেখানকার স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারবেন। তারাও ভালভাবে সাহেবিয়ানা রপ্ত করে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে।

ভারত সরকারের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি জাহাজে চেপে বসলেন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে।

অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র সাত বছর।

ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে এসে বসবাস করতে লাগলেন সকলে। তিন পুত্র ভর্তি হলো ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুলে। মিষ্টার ও মিসেস ড্রয়েট নামক এক সুশিক্ষিত ইংরাজ পরিবার এদের ভার নিলেন।

এই শহরেই তিনি চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলেন কিন্তু অল্পদিন পরেই বুঝতে পারলেন এখানে চিকিৎসক হিসাবে তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না।

তিন পুত্রের মধ্যে অরবিন্দের উপরই ড্রয়েট পরিবারের দৃষ্টি বেশী পড়েছিল কারণ তারা তার প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন।

মিঃ ড্রয়েট তাকে ল্যাটিন ভাষা শেখাতে লাগলেন আর মিসেস ড্রয়েট শেখাতে লাগলেন ইংরাজী ভাষা।

ড্রয়েট দম্পতির ঐকান্তিক যত্নে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিভাধর অরবিন্দ ল্যাটিন ও ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে উঠল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনের কনিষ্ঠ পুত্র ভাবী বিপ্লবী বারীন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করল ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে।

এই সময়ই কৃষ্ণধনের চিকিৎসা ব্যবসায়ের মন্দার দরুণ দারুন অর্থকষ্ট দেখা দিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের মত শহরে পরিবার নিয়ে বাস

করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি এই কথা জানালেন শ্বশুর রাজনারায়ণকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সাহায্য পাঠালেন, সেই সঙ্গে তাঁকে পরামর্শ দিলেন দেশে ফিরে আসার জন্য।

কৃষ্ণধন এই পরামর্শ মত ভারত অভিমুখে রওনা হলেন। স্বদেশে ফিরে ভারত সরকারের অধীনে সিভিল সার্জেনের পদ গ্রহণ করলেন। এই সময় শ্বশুর রাজনারায়ণ দেওঘরে থাকতেন। স্বর্ণলতার ম্যাঞ্চেষ্টার যাওয়ার পরও অসুখ অপরিবর্তিত থাকায় তাঁকে এবং কন্যা সরোজিনী ও কনিষ্ঠ পুত্র বারীন দেওঘরে থাকলেন। বিনয়, মনোমোহন ও অরবিন্দ ম্যাঞ্চেষ্টারে থেকেই পড়াশুনা করতে লাগলো।

বিনয়কুমার শিক্ষা সমাপ্ত করে চিকিৎসক হওয়ার আশায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস-এর পরীক্ষায় বসেন কিন্তু অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষা দেন কিন্তু এতেও উত্তীর্ণ হতে পারলেন না।

দুটি পরীক্ষাতেই অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁর মন ভেঙ্গে গেল। তিনি আর চেষ্টা না করে স্বদেশে ফিরলেন। এসে কুচবিহারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে চাকুরী নিলেন।

মনোমোহন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিস নিয়ে ঢাকায় একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। এর কিছুদিন পর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেই সময় খুব কম ভারতীয়ই তাঁর মত অত সুন্দর ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারতেন। শুধু গদ্য সাহিত্যই নয়, তিনি ইংরাজী কবিতাও রচনা করতেন। সারা বিশ্বে তিনি কবি মনোমোহন ঘোষ নামে সুপরিচিত ছিলেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের সেণ্ট পলস্ স্কুলে পড়াশুনা করতে লাগলেন অরবিন্দ। তিনি কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে নিজেই খাতা-কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসতেন। তাঁর কাব্য-প্রতিভা অতি শৈশব থেকেই প্রকাশিত হয়। তিনি যখন দার্জিলিং-এ ছিলেন তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন ইংরাজী ভাষায়। সেই কবিতা পাঠ করে কনভেণ্টের শিক্ষয়িত্রী তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, এই বালক একসময় বিখ্যাত কবি হবে। তাঁর সেদিনকার ভবিষ্যৎবাণী কালে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

দীর্ঘ ছ' বছর মাঞ্চেষ্টারের স্কুলে পড়াশুনা করলেন অরবিন্দ। এই সময়ে তিনি ইংরাজী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন।

এরপর অরবিন্দের জীবনে এলো পরিবর্তন। ম্যাঞ্চেষ্টার হতে ড্রয়েট পরিবার অন্যত্র চলে যান। তখন অরবিন্দ তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে এলেন লণ্ডনে। সে সময়টা ছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। লণ্ডনে এসে অরবিন্দ সেণ্ট্ পল্স স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। ছ' বছরের মধ্যেই গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞান লক্ষ্য করে স্থানীয় শিক্ষকগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন।

কেবল গ্রীক আর ল্যাটিন ভাষায় কেন, ফরাসী, ইংরাজী, ইতালিয়ান, জার্মান, রাশিয়ান আর স্প্যানিস ভাষাতেও অসাধারণ জ্ঞান আহরণ করলেন অরবিন্দ।

কেবল ভাষা শিক্ষাতেই তাঁর মন অষ্টপ্রহর নিয়োজিত রইলো না। ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐসকল ভাষায় লেখা কাব্য, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে আপনার জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিভা লক্ষ্য করে সেণ্ট্ পলস্ স্কুলের শিক্ষকগণ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এই বিদ্যালয়ে এর আগে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করেছে বটে কিন্তু এর মত এমন প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র এর আগে কখনো দেখিনি।

অরবিন্দ ইংরাজী ভাষায় তো কবিতা রচনা করতেনই। এছাড়া তিনি অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও কাব্য রচনা করতেন। একবার তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনা করে ঐ স্কুল থেকে প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। কেবল কি পুরস্কার, তার সঙ্গে শিক্ষকদের কাছ থেকে অভাবনীয় প্রশংসা লাভ করেন।

এতসব পড়াশুনো সত্বেও আপনার মূল পাঠ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকতো অরবিন্দের। অন্যান্য পুস্তক পাঠ করছেন বলে নিজের পুস্তক পাঠে কোনরকম অমনোযোগী হননি কখনো। তাই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে চল্লিশ পাউণ্ড বৃত্তি লাভ করেন।

তাঁর এই কৃতিত্বের সংবাদ এসে পৌঁছলো ভারতে। কৃষ্ণধন শুনে খুশী হলেন। ভাবলেন, এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। পুত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিলেন, আরও ভাল করে পড়াশুনা করো। আমি তোমার সম্বন্ধে খুব আশাবাদী।

দাদামশাই দেওঘরে ছিলেন। তাঁর কাছেও সংবাদ পৌঁছলো। তিনিও শুনে আনন্দিত হলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর অরবিন্দ প্রস্তুত হতে লাগলেন কেমব্রিজ ক্লাসিক্স পরীক্ষার জন্যে। এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন সেণ্ট্ পলস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। সেণ্ট্ পলস্ স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হলো।

এইসময় অরবিন্দের ডাক পড়লো। প্রধান শিক্ষকমশাই অরবিন্দকে ডেকে বললেন, তুমি এই উৎসবে একটা ইংরিজী কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে?

অরবিন্দ ঘাড় নেড়ে তক্ষুনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ—পারবো। কিন্তু কার কবিতা আবৃত্তি করবো?

প্রধান শিক্ষকমশাই বললেন, কেন, কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা।

—কোন কবিতাটা ?

—'কোকিলের প্রতি' কবিতাটা আবৃত্তি করো না। ওটা বেশ ভাল লাগে আমার। তাছাড়া তোমার গলাও মিষ্টি। শোনাবে ভাল।

—আচ্ছা তাই করবো।

এরপর নির্দিষ্ট দিনে অরবিন্দ একটা মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে নম্রভাবে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে 'কোকিলেব প্রতি' কবিতাটি মধুব সুরে আবৃত্তি করলেন।

তিনি যতক্ষণ ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন ততক্ষণ ঘরে সমাগত অসংখ্য লোক একটি কথাও বলেননি।

তারপর যেই তাঁর আবৃত্তি শেষ হয়ে গেল অমনি জোড়া জোড়া হাততালি পড়লো। সে কি আনন্দেব ধূম। যাঁরা হলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেই ছাত্রদের অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ আনন্দে ফেটে পড়লেন। সমস্বরে অরবিন্দের প্রশংসা করতে লাগলেন।

আবৃত্তি হয়ে গেলে অরবিন্দ যখন মঞ্চ থেকে নেমে এলেন তখন একদল সাহেব তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর জানাতে লাগলেন।

অরবিন্দও খুশীতে নৃত্য করতে লাগলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হলে নিজের বাসায় ফিরে এসে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলেন একটি কবিতা। কবিতাটিব নাম হচ্ছে "To the cuckoo"।

অরবিন্দের শিক্ষকগণ এবং ছাত্রবন্ধুবা কবিতাটি পাঠ করে আনন্দ বোধ করলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন যাতে তিনি ভাবীকালে এর তুলনায় আরও সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ।

লণ্ডনের কিংস কলেজ হচ্ছে সবচেয়ে নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভিজাত ও ধনী শ্রেণীর ছাত্ররা এই কলেজে পড়াশুনো করতে পারতো। অরবিন্দ ঐ কলেজে ভর্তি হলেন এবং ক্লাসিক পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন।

দীর্ঘ এক বছর ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করলেন অরবিন্দ।

এরপর এলো ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ।

এই বছর অরবিন্দ কেমব্রিজ ক্লাসিক্যাল ট্রাইপোজ পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি ঐ পরীক্ষায় এত বেশী নম্বর পেয়েছিলেন যা এর আগে আর কেউ পায়নি।

তাঁর পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করেন ইংলণ্ডের স্বনামধন্য কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর সুযোগ্য পুত্র অস্কার ব্রাউনিং।

পরীক্ষার পর অরবিন্দকে বললেন,

'I have been examiner for scholarship examination for thirteen years and during that time I have never seen such a paper like, yours. Your Essays are excellent.'

অর্থাৎ—আমি গত তেরো বছর ধরে স্কলারশিপ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত আছি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমি যত ছাত্রের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেছি তার মধ্যে তোমার তুলনায় কাউকে ভাল দেখিনি। তোমার প্রবন্ধ রচনা সুন্দর হয়েছে।

প্রশংসাবিমুখ অরবিন্দর চিত্ত এর ফলে উত্তেজিত হলো না। তিনি হাসলেন মাত্র। তাঁর ঐ হাসির মধ্যে প্রকাশ পেল অনাশক্তির ভাব।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করলেন অরবিন্দ। পিতার কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি খুশী হলেন। পুত্রকে আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র লিখলেন। আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার পাশের খবর শুনে। আমি চাই, তুমি আই. সি. এস্ পরীক্ষা দাও।

• পিতার আদেশ অমান্য করতে পারলেন না অরবিন্দ। তিনি আই· সি· এস্ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হলেন। কিন্তু মনের অন্তস্থলে ছিল অন্য প্রকার অবস্থা। আই· সি· এস্ পাশ করে এসে অন্যান্য পাঁচটা সিভিলিয়ানের মত ভারত সরকারের অধীনে কাজ করতে তাঁর মন চাইলো না। তিনি গোলামীগিরি ভালবাসতেন না। বাল্যকাল হতে পিতার মুখে শুনে আসছিলেন পরাধীন ভারতের শোচনীয় দুরবস্থা। তাই দুঃখিনী জননীর মুক্তির জন্য ঐ বয়সেই তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, বিলাতে এসেছি লেখাপড়া শিখতে, নিছক অর্থ উপার্জন করতে আসিনি। যথার্থ জ্ঞান লাভ করে ভারতে ফিরে যেতে হবে এবং নিজেকে মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

বিপ্লবী নগেন্দ্র কুমার লিখেছেন : '...অরবিন্দের পিতা ডাক্তার কে. ডি· ঘোষ বিলাতে পুত্রদের জন্য বাংলা দেশ হইতে সংবাদপত্রের কাটিং পাঠাইয়া এবং তৎসঙ্গে চিঠি লিখিয়া ভারতবাসীদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটনাগুলি জানাইয়া দিতেন। তিনি চিঠিতে ওই সমস্ত ঘটনায় গভর্ণমেন্টের ঔদাসীন্যের নিন্দাও তীব্র ভাষায় করিতেন। পনর-ষোল বৎসর বয়সে কিশোর অরবিন্দের মনের উপর ওই সমুদয় ও পিতৃদেবের মন্তব্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। স্বদেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্খা তাঁহার হৃদয়ে জাগে। যখন তিনি কেমব্রিজে অধ্যয়ণ করিতে ছিলেন, তথাকার 'ইণ্ডিয়ান মজলিস' নামক ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানে অনেক বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অরবিন্দ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে,—সেই কারণে বিদেশী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সিভিল্ সার্ভিস্ হইতে বাদ দিয়াছেন, তবে অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা একটা উপলক্ষ মাত্র। বিলাতে অশ্বারোহণের পরীক্ষায় প্রার্থী অকৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে নেওয়া হইয়াছে।' অরবিন্দ 'ইণ্ডিয়ান্ মজলিস্'-এর সদস্য ছিলেন এবং কিছু কাল সম্পাদকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

'অরবিন্দের লেখা হইতে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে,—বিলাতে ভারতীয় ছাত্রেরা 'লোটাস্ য্যাণ্ড ড্যাগার' নামে একটা গুপ্ত সমিতি (সিক্রেট সোসাইটি) স্থাপনার্থ মিলিত হইয়াছিলেন। উহার প্রত্যেক সদস্যকে দাসত্ব মোচনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতে হইত এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহাকে নির্দিষ্ট কাজও করিতে হইত। অরবিন্দ এবং তাঁহার দুই ভাই বিনয় ও মনোমোহন সেই গুপ্ত সমিতির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।'

লণ্ডনে থাকাকালীন অরবিন্দ ঠিক ভারতীয় ভাব নিয়ে থাকতেন। তিনি দীর্ঘ বারো বছর সেখানে কাটালেন বটে কিন্তু পুরো সাহেব হয়ে গেলেন না। তাঁর আহারে-বিহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছদে যথার্থ সংযম লক্ষ্য করা গেছে।

(পিতার একান্ত ইচ্ছায় তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিলেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণও হলেন।) ঐ পরীক্ষায় তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় যত নম্বর পান তা তাঁর আগে বা পরে আর কেউ পায়নি। ?

তিনি আই. সি. এস্ পরীক্ষায় প্রথম হন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বিচক্রফট্ সাহেব। এই বিচক্রফট্ সাহেবই আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের বিচার করেন।

তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, বিচার বিভাগে কাজ করতে হলে আই. সি. এস্ পরীক্ষার সঙ্গে অশ্বারোহণের যোগ্যতাও প্রমাণিত করতে হবে।

অরবিন্দের মনে ইচ্ছা ছিল না তিনি ইংরাজ রাজ সরকারের অধীনে চাকরী নেন। তিনি ছিলেন আজীবন স্বাধীনতাপ্রিয়। গোলামী করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। (তাই তিনি প্রথমবার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে অশ্বারোহণ পরীক্ষায় যোগ দিলেন। সেবার তিনি ঐ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন। পরের বছর আবার ঐ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এবারও ঐ একই অবস্থা।) ?

(তিনি পিতাকে নিরাশ করলেন এই ব্যাপারে। পিতা

কৃষ্ণধনের অনেকদিন ধরে মনের কোণে ইচ্ছা ছিল যে তাঁর কৃতী পুত্র অরবিন্দ একজন সিভিলিয়ান হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হলো না।

ওদিকে পিতা পুত্রের সিভিল সার্ভিস এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ পেয়ে মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন যে অরবিন্দ দেশে ফিরে এসে তার বিদ্যার প্রয়োগে দেশের শাসনব্যবস্থা সুন্দরভাবে গড়ে তুলবেন। এই আশায় তিনি ১৮৯০ সালে তাঁর বড় শ্যালক যোগেন্দ্র নাথ বসুকে একখানি পত্র লেখেন…

'Ara I hope will glorify his country by brilliant administration. I shall not live to see it…'

পিতার এই আশা পূর্ণ করতে পারেননি অরবিন্দ। তবে তিনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে সমর্থ হয়েছিলেন অন্যভাবে।

সিভিল সার্ভিস এবং বি. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন অরবিন্দ। তিনি ভারতসরকারের অধীনে কোন চাকরী গ্রহণ করলেন না। পরীক্ষার পর যে কয়দিন তিনি লণ্ডনে ছিলেন সেই কয়দিন সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে কিছু অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন।

এই সময় তাঁর মনে রাজনৈতিক চর্চা এসে ঠাঁই নিলো। তিনি বিশ্বপরিস্থিতি তথা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে দিনের পর দিন চিন্তা করতে লাগলেন। ভারতবর্ষ তখন ইংরাজদের হাতে পরাধীন ছিল। তার ফলে ভারতমাতার দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। বাল্যকালে পিতা কৃষ্ণধনের কাছে শুনেছিলেন ভারতমাতার পরাধীন অবস্থার কথা। এখন যৌবনে তিনি ভারতমাতার পরিচয় ঠিক ঠিক ভাবে জানবার জন্য বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ সংসংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন। এই সব গ্রন্থ যত পড়তে থাকেন ততই

তাঁর মন ভারতমাতার সুমহান প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো।

তিনি যখন কেমব্রিজের ছাত্র ছিলেন সেই সময় ভারতীয় মজলিসের একজন সভ্য হন। তখন ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এবং তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। এছাড়া তিন ভাই মিলে প্রবাসে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন। আয়ারল্যাণ্ডের কয়েকজন ছাত্র এই সমিতিতে যোগদান করেন। তাঁরা ছিলেন আয়ারল্যাণ্ড মুক্তি যুদ্ধের সমর্থক। এককালে আয়ারল্যাণ্ড ছিল ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন। তার স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহী আয়ারল্যাণ্ডবাসীরা স্বাধীনতাসংগ্রাম শুরু করলো। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দাবী ভারতবাসীদের দাবীরই সমতুল্য। তাই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তাদের সায় না থেকে পারে নি। সেই কারণে কয়েকজন প্রগতিবাদী আইরিশ যুবক ছাত্র অরবিন্দ সৃষ্ট গুপ্ত সমিতিতে অংশ নিয়েছিল। তাঁর ঐ গুপ্ত সমিতির নাম ছিল 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার'। এই সমিতিতে যারা যোগদান করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে এই বলে শপথ নেন যে যেকোন প্রকারেই হোক ভারতের মুক্তির জন্যে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

পরবর্তীকালে এই সমিতির কার্য্যকলাপ এবং অস্তিত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেও অনেকে সেই মহান প্রতিশ্রুতি রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন স্বয়ং অরবিন্দ।

ঐসময় সুবিখ্যাত মডারেটপন্থী নেতা দাদাভাই নৌরজী ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অরবিন্দের দেশের কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা হলো। অরবিন্দ কিন্তু তাঁর মত সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন ভারতকে স্বাধীন করতে হলে প্রয়োজন হবে বিপ্লবের। ইংরাজরা মুখের কথায় ভারত ছাড়বে না, পরন্তু তাকে পাকে-প্রকারে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে।

এই সময় অরবিন্দের হাতে এসে পৌঁছয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস আনন্দমঠ। তিনি বাংলা ভাষা পড়তে পারতেন না। তাই অন্যের কাছ থেকে ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তু শুনে দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা পেলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন, সময় ও সুযোগ এলে একদিন তিনি আনন্দমঠের বিষয়বস্তু হাতে-কলমে প্রয়োগ করে দেশবাসীর সামনে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবেন।

একদিন কৃষ্ণধন শুনতে পেলেন তাঁর কৃতীপুত্র অরবিন্দ ঘোষ আই. সি. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকারের অধীনে কোন চাকরী গ্রহণ করতে রাজী নন।

এই প্রকার কথা শোনার পর কৃষ্ণধন পুত্রকে এক পত্র লিখে জানালেন, আর ওখানে থেকে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কি আছে। তুমি সত্বর ফিরে এসো ভারতে।

চিঠি পেয়ে অরবিন্দ ভারতে ফেরবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পিতার পত্রের জবাবে ফিরবার তারিখ এবং জাহাজের নাম জানিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণধন সেইমত নিশ্চিন্ত মনে দিন গুণতে লাগলেন।

কিন্তু বিধাতার কি নিয়ম তা কে বলতে পারে। একদিন তাঁর কাছে খবর এলো, যে জাহাজে চেপে অরবিন্দের ভারত ফেরবার কথা হঠাৎ সেই জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে।

এই মর্মন্তুদ সংবাদ শোনামাত্র তিনি শোকাহত হলেন এবং শোক অপনোদনের আশায় ঘন ঘন মদ খেতে লাগলেন। শরীরের ওপর আর কোনরকম মমতা রইলো না।

অতিরিক্ত সুরাপানের কুফল ফললো অচিরে। একদিন তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে মর্তলোক ছেড়ে চলে গেলেন।

ওদিকে অরবিন্দ পিতার পত্র পেয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হবার জন্য তৎপর হলেন। সেই সময় তাঁর মনে আর এক চিন্তা মাথা

চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। তিনি তো সিভিল সার্ভিস গ্রহণ করবেন না। তাহলে তাঁকে অন্য চাকরী গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারী তেমন ভাল চাকরী পাওয়া যাবে কোথায়? তাঁর যোগ্যতা আছে অনেক কিন্তু সেইমত চাকরী পাওয়া যাবে কি?

এই প্রকার যখন চিন্তা করতে লাগলেন অরবিন্দ সেই সময় তাঁর ভাগ্যে জুটে গেল এক অসাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ।

এই অসাধারণ মানুষটি হলেন বরোদার মহারাজা। তিনি লণ্ডনে এসেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি· এ· পরীক্ষা দেবার জন্যে।

ভারত ত্যাগ করার আগেই তিনি অরবিন্দের বিদ্যা-বুদ্ধির কথা কিছু কিছু শুনেছিলেন। তাই লণ্ডনে আসামাত্র তিনি অরবিন্দের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

ওদিকে অরবিন্দও শুনলেন বরোদার মহারাজা এসেছেন লণ্ডনে; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো একজন অপরিচিত সাধারণ মানুষের পক্ষে রাজা-মহারাজার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। তার জন্যে প্রয়োজন হয় পরিচিতি-পত্র। এখন সমস্যা হলো পরিচয়-পত্র যোগাড় করা। কে দেবেন অরবিন্দকে পরিচয়-পত্র?

ঈশ্বরের ইচ্ছায় অরবিন্দের জীবনে ঘটে গেল এক শুভ যোগাযোগ। তিনি পরিচয়-পত্র পেলেন। তদানীন্তন আসামের চীফ্ কমিশনার স্যার হেনরী কটনের ভাই ছিলেন লণ্ডনে তিনি অরবিন্দ এবং বরোদার মহারাজা দু'জনকেই চিনতেন। তাই তিনি পরিচয়পত্র লিখে অরবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি এই চিঠি নিয়ে চলে যান মহারাজার কাছে। তিনি আপনার বক্তব্য শুনবেন।

অরবিন্দও সেইমত গেলেন মহারাজার কাছে। প্রথম দর্শনেই মহারাজা প্রতিভায় উজ্জ্বল মুখ, ধীর গম্ভীর প্রকৃতি, স্বল্পবাক্ এবং

অনাড়ম্বর অরবিন্দকে দেখে মুগ্ধ হলেন। অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বয়েসও মিলে গেল। তিনি অরবিন্দকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন। কেবল তাই নয় তিনি একথাও বললেন, আপনার এখন স্বদেশে ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি আমার সঙ্গে এখানে কিছুদিন থাকুন। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কাজ করুন।

অরবিন্দও রাজী হলেন মহারাজার প্রস্তাবে। তিনি তো এই রকম একটি সুযোগের সন্ধানই করছিলেন। এবার সেই সুযোগ তার এসে গেল।

মনে মনে এও চিন্তা করলেন অরবিন্দ যে দেশের কাজ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন হবে। মহারাজার আশ্রয়ে থেকে এদিক দিয়ে হয়তো কিছু সুবিধে হতে পারে। তাছাড়া তাঁর মনে পড়ে গেল পরিব্রাজক বিবেকানন্দের কথা। তিনিও চেয়েছিলেন দেশের জাগরণ। দেশের বড় বড় রাজা-মহারাজা যদি নিজেদের ত্যাগ স্বীকার করে দরিদ্র ভারতবাসীদের পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে ভারতের সর্বপ্রকার উন্নতি তথা পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে আর কতক্ষণ।

এখন থেকে অরবিন্দের জীবনে উত্তম কালের সূচনা হলো। তিনি মহারাজার সঙ্গে দু'বছর যাবৎ লণ্ডনে রইলেন। এই দু'বছর তিনি ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করতে লাগলেন। তাঁর এই সকল পুস্তক পাঠের অন্তরালে একটা রহস্যও ছিল। এতদিন ধরে অর্থাৎ দীর্ঘ বারো বছর ধরে তিনি লণ্ডনে অবস্থান করে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি আয়ত্ত করেছেন। এবার প্রাচ্যে কি আছে তাই জানবার জন্যে তাঁর মনে ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল। তিনি চিন্তা করলেন, পৃথিবীর দুই গোলার্দ্ধের ভাব ও জ্ঞান আয়ত্ত করার পর এমন এক জিনিষ সৃষ্টি করবেন ভাব জগতে যার প্রভাবে জগৎবাসীর জীবনে চিরস্থায়ী কল্যাণের সূচনা হতে পারে। তাঁর এই স্বপ্ন পরবর্তী জীবনে

সত্য ও সার্থক হয়ে দেখা দেয়। অরবিন্দের পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে আমরা এই মহা সত্যের উপলব্ধি বুঝতে পারবো। তিনি যে যুগপুরুষ এবং ভারতের ভাগ্য নির্ণয়কারী এ বিষয়ে তাঁর কর্মধারাই যথার্থ প্রমাণ দিয়েছে। তিনি ছিলেন একান্ত সহজ সরল মানুষ। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে—'প্লেন্ লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং।' অরবিন্দের জীবনে এই বাক্য সার্থক হয়ে উঠেছিল। নচেৎ এতকাল লণ্ডনে অবস্থান করেও তাঁর বেশভূষার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন দেখা দিলো না কেন? গলাবন্ধ কোট ও সামান্য ধুতি এবং পাজামা পরে দিন কাটাতেন। সময়ে সময়ে কোটের বোতামও খোলা থাকতো। তিনি বোতাম লাগাতেও ভুলে যেতেন। সব সময় তাঁর চিত্ত গভীর পাঠ তৃষ্ণায় মগ্ন থাকতো। যেন সেই কাজ ছিল তাঁর কাছে ভগবৎ আরাধনা —ঈশ্বরোপলব্ধির জন্যে একনিষ্ঠ সাধনা।

দীর্ঘ চোদ্দ বছর লণ্ডনে অবস্থান করার পর অরবিন্দ ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে যখন জাহাজ এসে ভিড়লো তখন অরবিন্দের মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠলো। তিনি এতদিন বিদেশে ছিলেন, স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান নেই ঠিক তবু তিনি স্বদেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন এক অকথিত সুখের স্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তঃকরণ বেদনায় ভার হয়ে উঠলো যখন তিনি ভাবতে লাগলেন পরাধীন দেশজননীর অসাধারণ দুঃখ দুর্দশার কথা। ইংরাজ ছলেবলে কৌশলে ভারত-বর্ষ জয় করে দিনের পর দিন শোষণ ও শাসন করে ভারতবাসীদের নির্জীব করে রেখেছে। অথচ একসময় এই ভারতের কত না ঐশ্বর্য্য ছিল। যেমন ছিল ধনদৌলত তেমনি ছিল বিদ্যাবুদ্ধি। তিনি এতদিন পশ্চিমবাসী হয়ে ছিলেন বলে ভারতবর্ষকে ঠিক ঠিক ভাবে

জানতে পারলেন তার দ্বারা উপলব্ধি করলেন ভারতের পূর্বগৌরব। হাজার বছর আগে ভারত যেসব চিন্তা করে গেছে তা মানবজাতির মঙ্গলকর এবং শাশ্বত। ইংরাজ ভারতবর্ষকে জয় করলেও তার প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিনাশ করতে পারেনি। সেই প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যেই সুপ্ত আছে ভারত-আত্মার বাণী। সেই বাণীকে বাঙ্‌ময় রূপ দিয়ে প্রাণবন্ত করতে পারলেই ভারতবাসীদের মধ্যে চেতনা ফিরে আসবে। আর চেতনা ফিরলেই ভারতবাসীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে পরাধীনতার দুঃখ ও গ্লানি। তখন তারা এই প্রকার গ্লানি অপনোদনের জন্যে সংগ্রামমুখী হয়ে উঠবে।

ভারতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার চিন্তা অরবিন্দের অবচেতন মন আপনা থেকেই প্রকাশ পেল। এ বোধহয় মাটির মায়ের আকর্ষণ কিংবা ভারত ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা।

যাহোক অরবিন্দ বোম্বাই হতে চলে এলেন বিহারে। দেওঘরে তখন তাঁর দাদামশাই রাজনারায়ণ বসু অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা বোন ও ছোট ভাই বারীন।

অরবিন্দ ঘরে প্রবেশ করেই দাদামশাইয়ের শ্রীচরণে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করলেন।

দাদামশাই তাঁকে সস্নেহ আশীর্বাদ করে বললেন, দীর্ঘজীবী হও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

এরপর ঋষি রাজনারায়ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে লাগলেন অরবিন্দের ধীর-স্থির প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে। তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অরবিন্দের মুখের দিকে। তাঁর চোখ দুটি হতে প্রকাশিত হচ্ছে অতিন্দ্রিয় ধ্যান জগতের আলোক ঝরণা। সেই ঝরণার মধ্যে থেকে প্রকাশিত হচ্ছে প্রবীণ ও নবীন ভারতের মিলিত রূপ।

এই প্রকার সত্য উপলব্ধির পর বুঝতে পারলেন, তার দৌহিত্র

অরবিন্দ ঘোষ ভাবী কালে একজন মহাপুরুষ হবে। তিনি জামাতার মধ্যে অনুসন্ধান করে পাননি আজ এতকাল পরে দৌহিত্রের জীবনে সেই সত্যের আলোক দেখে আনন্দিত হলেন। বুঝলেন এই যুবক কালে ভারতপুরুষ রূপে দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দেবে।

তারপর বললেন, জানি সিভিল সার্ভিস তোমার জন্যে নয়। ঈশ্বর তোমার জন্যে আলাদা কর্ম স্থির করে রেখেছেন। তুমি তাঁর কর্ম সম্পাদনের জন্যে ব্রতী হও।

ঋষি রাজনারায়ণকে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করলেন অরবিন্দ।

ঋষি আবার শান্ত-সরল কণ্ঠে দৌহিত্রের শিরে সাধনধন্য কর স্থাপন করে বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

অরবিন্দ দাদামশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন মায়ের কাছে।

মার শ্রীচরণে ভক্তি প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু মার কাছ থেকে পেলেন না স্নেহের আহ্বান। কেবল দেখলেন, মা নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন পুত্রের মুখের দিকে। কি যেন মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে অস্ফুট স্বরে বলছেন।

অরবিন্দ বুঝতে পারলেন না সে ভাষা। ভাবলেন, মাব মাথাব ঠিক নেই।

কিছুক্ষণ মার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার পব তিনি ফিরে এলেন নিজের কামরায়।

দেওঘরে কয়েকদিন কাটিয়ে অরবিন্দ বিষণ্ন মনে চলে এলেন বরোদায়। এখানে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

পরে মহারাজা তাঁকে রাজস্ব বিভাগের কাজ দিলে অরবিন্দ কৃতিত্বের সঙ্গে তা সম্পন্ন করেন।

কিন্তু এ কাজে বেশীদিন লিপ্ত থাকতে চাইলেন না অরবিন্দ। তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন তার দ্বারা এই কাজে থাকা তাঁর পক্ষে আদৌ সুখকর ছিল না। অথচ তাঁর মনের ভাব বা অসোয়াস্তি ভাষায় ব্যক্ত করতেন না।

বরোদার মহারাজা অরবিন্দের সঙ্গে আরও ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করে জানতে পারলেন তাঁর মনের খবর।

তখন তিনি অরবিন্দের কর্মস্থল পরিবর্তন করে তাঁর কলেজে ইতিহাস ও রাজনীতির অধ্যাপকের পদ দিলেন।

এতদিন পরে অরবিন্দ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন যে তিনি যোগ্য পদে ব্রতী হয়েছেন।

বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন অরবিন্দ। ছাত্ররা মহাখুশী তাঁর মত একজন শান্তশিষ্ট এবং জ্ঞানী গুণী অধ্যাপককে কাছে পেয়ে।

অরবিন্দ ক্লাসে এসে এমন ভাবে পড়াতেন যেন ছাত্ররা মনে করতো তিনি তাদের আপন জন। যেমন তাঁর মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর ভাষার ঝঙ্কার তেমনি তার বোঝাবার অদ্ভুত ক্ষমতা। এমন আন্তরিকতাপূর্ণ শিক্ষকতার জন্যে ছাত্ররা তাঁকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে লাগলো। তারা অরবিন্দের কাছে পুত্রাধিক স্নেহ লাভ করতো।

যে পাঠ্য বিষয় ছাত্ররা বুঝতে পারতো না অরবিন্দ বারংবার ছাত্রদের কাছে তা ব্যাখ্যা করে দিতেন।

তখন ছাত্ররা বাড়িতে এসে কঠিন পাঠ্যবস্তু একবার পড়ার পর অনায়াসে অর্থ করে নিতে পারতো।

ক্রমে মহারাজার কানে পৌঁছলো অরবিন্দের অপূর্ব শিক্ষকতার কথা।

শুনে সন্তুষ্ট হলেন মহারাজা। তিনি হুকুম দিলেন অরবিন্দের মত গুণী-জ্ঞানী অধ্যাপকের হাতে রাজকলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হোক।

কলেজ কমিটি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলেন মহারাজার প্রস্তাব।

অরবিন্দ অচিরে রাজকলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হলেন।

এই পদোন্নতির জন্যে কিছুমাত্র গর্ববোধ করলেন না অরবিন্দ। তাঁর মনে দানা বাঁধলো না অহঙ্কার। নির্লোভ—নির্লিপ্ত হৃদয় নিয়ে তিনি ছাত্রদেব পড়িয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ও রীতিনীতি দেখে মনে হতো তিনি যেন এই কাজকে তপস্যার মত গ্রহণ কবেছেন।

তিনি যখন ক্লাসঘরে সুমধুর কণ্ঠে ও শান্তভাবে বক্তৃতা দিতেন তখন ছাত্ররা অপলক নয়নে এবং ধীর-স্থির চিত্তে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর এবং তপস্বীসম মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। একটি বিষয় বোঝাতে গিয়ে তিনি অবতারণা করতেন একাধিক বিষয়। তাঁর সুন্দর অধ্যাপনার মধ্যে ফাঁকি বা অপূর্ণতা থাকতো না। এর ওপব ছিল আন্তরিকতা। এই দুয়ে মিলে তাঁর অধ্যাপনা সর্বাঙ্গসুন্দর হতো।

রাজপ্রাসাদে মহারাজার সঙ্গে অবস্থান কবতেন অববিন্দ। জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করা তাঁর আজন্ম অভ্যাসের প্রতিকূল ছিল। তাই এই প্রকার জীবনযাত্রা তিনি উত্তম বলে মনে করলেন না।

তাঁর অবশ্য কোনরকম অসুবিধে বা অনিয়ম হতো না। চাকব-বাকর দাসদাসী অনেক ছিল। ভাল আহারের ব্যবস্থা ছিল, থাকবার জন্যে উত্তম ঘর ছিল। দুগ্ধফেননিভ শয্যা সর্বদা প্রস্তুত থাকতো তাঁর জন্যে। প্রতিদিন তাঁর শয্যা পরিস্কার রাখার দায়িত্ব থাকতো চাকর-বাকরের হাতে।

এত ভোগবিলাসেব মধ্যে থাকতে ভাল লাগতো না অরবিন্দের। সরল এবং সাদাসিধে মানুষ অরবিন্দ একদিন মহারাজার সঙ্গে দেখা করে বললেন মনের কথা, মহারাজ! আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি আপনাকে একটা কথা বলি।

মহারাজা কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, বলুন আপনার কি কথা আছে।

অরবিন্দ বললেন, আমার জন্যে আপনার যত্নের কোন শেষ নেই। আপনি রাজপ্রাসাদে আমাকে আশ্রয় দিয়ে মহাসুখে রেখেছেন। এর জন্যে আমার কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি বড় অসুবিধা বোধ করছি কারণ আমি রাজপ্রাসাদে থাকি বলে অনেক ছাত্র আমার কাছে আসতে পারে না।

অরবিন্দের কথা শেষ না হতেই মহারাজা প্রশ্ন করলেন, তা আপনি কি করতে চান?

অরবিন্দ বললেন, আমি এই ব্যাপারে আপনার কাছে একটি নতুন প্রস্তাব রাখছি। আশা করি আপনি আমার বিষয়টি একবার ভেবে দেখবেন।

মহারাজা বললেন, বলুন আপনার কি প্রস্তাব। আমি আপনার ভালর জন্যে অনেককিছু করতে রাজী আছি।

অরবিন্দ বললেন, আমার একান্ত অনুরোধ, রাজপ্রাসাদের বাইরে আমার জন্যে যেন থাকার বন্দোবস্ত করা হয়।

মহারাজা হেসে বললেন, অর্থাৎ একটা ছোট কুটিরে থাকতে চান?

অরবিন্দ সহাস্যে বললেন, ঠিক তাই।

মহারাজা সম্মতি জানিয়ে বললেন, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

অরবিন্দ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন বটে কিন্তু প্রাসাদ সংলগ্ন একটি ছোট বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে বাস করতে লাগলেন। লোহার খাটের ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন করতেন। খাবারে আড়ম্বর ছিল না। ভাত, রুটি ও একটি তরকারি গ্রহণ করতেন। শীতে গায়ে জামা দিতেন না। পায়ে থাকতো একজোড়া নাগরা। পরণে মোটা সূতোর ধুতি।

কলেজে যখন যেতেন তখন কোট-প্যাণ্ট পরতেন। মাথায় টুপী না পরে পাগড়ী ধারণ করতেন।

এমনিভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ছাত্ররা তাঁর কাছে আসতে লাগলো। আর তাদের মনে প্রাসাদের আতঙ্ক রইলো না।

অনেকদিন পর ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠলো। অরবিন্দও মনে-প্রাণে তৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন।

একদিন বরোদার মহারাজা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বেশ কিছুদিনের জন্যে কাশ্মীর ভ্রমণে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আপনি সেখানে যাবেন কি?

অরবিন্দ বললেন, আপনি যদি চান তাহলে আমি যেতে রাজী আছি।

—বেশ অমুকদিন আমি যাবো।

—আচ্ছা, আমিও প্রস্তুত থাকবো।

নির্দিষ্ট দিনে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করলেন অরবিন্দ। সঙ্গে আছেন বরোদার মহারাজ এবং তাঁর কর্মচারীবৃন্দ।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্যাবলী দেখে মুগ্ধ হলেন অরবিন্দ। যত সেই অনিন্দ্যসুন্দর এবং অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভা দেখতে লাগলেন ততই মোহিত হয়ে গেলেন।

শেষকালে তিনি এলেন ক্ষীরভবানীর মন্দিরে। এখানে এসে কিছুক্ষণ ভাববিহ্বল নয়নে তাকিয়ে রইলেন মায়ের মুখের দিকে। বোধহয় তিনি মায়ের কাছে মনে-প্রাণে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে।

কিছুকাল কাশ্মীরে অবস্থান করে অরবিন্দ ফিরে এলেন বরোদায়।

কলেজের পড়ানো হয়ে গেলে বাসায় এসে অরবিন্দ গভীর রাত পর্য্যন্ত আলো জেলে লেখাপড়া করতেন। বিভিন্ন ভারতীয়

ভাষা শিখে সেই সব ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠে মনোযোগ দিতেন।

এতদিন তিনি বিলেতে থেকে ইংরিজী ভাষায় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তাতে করে তিনি ভারতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে উঠতে পারেননি। তাই এবার স্থির করলেন, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, ইতিহাস, রাজনীতি, ও অর্থনিতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করবেন।

যেমন সঙ্কল্প করলেন তেমনি কাজও হলো।

এবার তিনি মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা শিখে বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের রচনা পাঠ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

তার আগে তিনি মারাঠী, গুজরাটী, সংস্কৃত আর বরোদা রাজ্যের ছুটি ভাষা শিখে ফেললেন। সেই সঙ্গে ঐসকল ভাষায় রচিত বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করে অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করে তৃপ্তি পেলেন।

এত জ্ঞান লাভ করেও মনের অন্তঃস্থলে শান্তি পেলেন না অরবিন্দ। কারণ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিজের মাতৃভাষা শিখতে পারছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অন্তরের পূর্ণ তৃপ্তি হতে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত থাকছেন। তাছাড়া তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনও ফলপ্রসূ হবে না।

এইপ্রকার চিন্তা করার পর তিনি নিজে থেকেই মনোযোগ সহকারে বাংলা ভাষা শিখতে লাগলেন। সেই সঙ্গে জপ করতে লাগলেন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। এই বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে অরবিন্দ বঙ্কিমের আদর্শে দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। মন্ত্র জপ করতে করতে তিনি ভারতমাতার সত্তার সঙ্গে নিজের একাত্ম হওয়ার প্রেরণা উপলব্ধি করতেন। বন্দে মাতরম্ মন্ত্র ছিল তাঁর ধ্যান। এই মন্ত্রের মধ্যে তিনি অনুসন্ধান করেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের মহাপ্রেরণা এবং মহাশক্তি। আর কেনই বা সেই শক্তির সন্ধান পাবেন না অরবিন্দ। অধ্যাত্ম শাস্ত্র লিখেছে, নাম

আর নামী অভেদ সুতরাং বন্দে মাতরম্ মন্ত্র যে জপ করবে তাঁর মনে স্বতই অনুপ্রেরণা আসবে দেশ জননীকে শ্রদ্ধা এবং তাঁব অসীম দুঃখে অংশীদার হয়ে তাঁর মুক্তির পথ বাধামুক্ত করবার।

সহকারী অধ্যক্ষের বেতন ছিল প্রতিমাসে ৭৫০ টাকা। অরবিন্দ ঐ টাকা পেতেন। বেতনেব টাকা থেকে দুশো টাকা তিনি মাকে পাঠাতেন। আর পাঁচশো টাকা তিনি ব্যয় করতেন গরীব আত্মীয় ও দুঃস্থ মানুষদের সেবার জন্যে। এছাড়াও তিনি মাসে মাসে এক হাজার টাকা থেকে আরম্ভ করে দেড় হাজাব টাকা পর্য্যন্ত বই কিনতেন। এত টাকা তিনি কোথা হতে পেতেন? যা মাইনে পেতেন সে টাকার সমস্ত অংশই তো পরেব জন্যে ব্যয় কবতেন।

তাঁর টাকা জোগাতেন ববোদাব মহাবাজা। যখনি তাঁব টাকাব দরকার হতো তিনি মহারাজার কাছে চাইতেন। মহারাজা নিজেব কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে অববিন্দের যখন যা দবকাব হবে তা যেন তাঁকে দেওয়া হয়।

কর্মচারীরা তাঁকে প্রয়োজনমত অর্থ দিতেন। সুতরা' রাজার আশ্রয়ে থেকে অববিন্দ কোনবকম কষ্ট পাননি। তিনি নিজে অর্থ গ্রহণ করতেন না বটে কিন্তু যখনি অর্থেব দবকার হতো শ্লিপ লিখে দিলে সেই পরিমাণ অর্থ তাঁর হাতে এসে যেত। পরে কর্মচারীরা একটা খাতায তাঁর নামে মোট মাসিক ব্যয লিখে রাখতেন।

এরকম ত্যাগী পুরুষ বড একটা দেখা যায় না। নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের ভোগে ব্যয় না করে করছেন অন্যের ভোগে। সে যুগে যাঁরা বিলাতফেরৎ হয়ে এদেশে এসে মোটা মাইনেব চাকরী করতেন তাঁরা সকলেই ভোগবিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেন। নিজের সুখসুবিধা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, পরের সুখের কথা ক্ষণমাত্রও চিন্তা করতেন না। অরবিন্দ বিলাতফেরৎ এবং গুণী জ্ঞানী হয়েও নিজের

ভোগবাসনা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ত্যাগ ছিল তাঁর জন্মগত সংস্কার এবং প্রেম তার স্বভাবসুলভ গুণ। এই দু'টি শক্তির জন্যে তিনি জ্ঞানী এবং প্রেমী হতে পেরেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাই তিনি এই মহান গুণের বলে দেশের কাজ করেছেন আবার ঈশ্বরের উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন।

বরোদায় অবস্থানের সময় অরবিন্দ বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। তাই বাংলার প্রতি তাঁর আকর্ষণ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে লাগলেন।

তিনি স্থির করলেন, বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করবেন। আর তাঁর সেই কর্মপদ্ধতি তিনটি স্তরে ভাগ করবেন।

প্রথম স্তর হচ্ছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র নিয়ে বিপ্লবের সাধনা আরম্ভ করবেন। তারপর এই মন্ত্রে দেশবাসীদের হৃদয়ে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলবেন এবং সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবেন।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, অসহযোগ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথে সংগ্রাম শুরু করবেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, অধ্যাত্মশক্তিতে দেশকে স.ক্ষশালী করে ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

তাঁর মনের এই চিন্তা গোপন রাখলেন। কাউকে জানালেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি রজোগুণের প্রভাবে দেশকে জাগিয়ে তারপব সত্ত্বগুণের প্রভাবে ঈশ্বরেব মহিমা কীর্তন করে দেশ ও দশের মঙ্গল করবেন।

তিনি লেখার মাধ্যমে তাঁর মনের সুপ্ত বাসনা প্রকাশ করলেন। প্রথমে কলেজ ম্যাগাজিনে ভারতীয় ভা:ধারা নিয়ে কবিতা লিখতে লাগলেন। এগুলি লিখলেন ইংরাজি ভাষায়।

কিন্তু এতে তৃপ্তি পেলেন না। ভাবলেন এর দ্বারা জন-

সাধারণের মাঝখানে তাঁর চিন্তাধারার প্রচার হবে না। তাই তিনি আরও একটি ভাল পত্রিকার সন্ধান করতে লাগলেন।

তাঁর মনোমত পত্রিকার সন্ধানও পেলেন। তখন বোম্বাই থেকে একটি রাজনৈতিক বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তার নাম 'ইন্দুপ্রকাশ'। ঐ পত্রিকার সম্পাদকের নাম কে, জি, দেশপাণ্ডে। তিনি কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন।

অরবিন্দ দেশপাণ্ডেকে লিখলেন, আমি আপনার পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে চাই। আপনি আমার প্রবন্ধ ছাপাতে রাজী আছেন কি?

দেশপাণ্ডে তক্ষুনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, রাজী আছি। আপনি প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করুন। তিনি লিখলেন 'বন্দে মাতরম' এবং 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রসঙ্গে।

তিনিই একমাত্র ভারতবাসী বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর মন্ত্র বন্দে মাতরমের মহিমা উপলব্ধি করলেন এবং ভারতবাসীদের সামনে তা প্রকাশ করলেন। তাঁর অনুপ্রেরণা এবং প্রচারের মাধ্যমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র হিসাবে এই বন্দে মাতরমকে গ্রহণ করে। এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁরা প্রভূত বলের অধিকারী হন। পরবর্তী কালে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পর 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীতের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতও জাতীয় সংগীত রূপে জাতীয় পরিষদে গৃহীত হয়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন অরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায়। সর্বশেষ প্রবন্ধে লিখলেন: 'যা কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত বা রক্ষা হোক না কেন বঙ্কিমের খ্যাতি বিনষ্ট হতে পারে না···

'হে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধুরন্ধরগণ, আপনাদের দৃষ্টি আজ শাসন পরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ···বঙ্কিমচন্দ্র আপনাদের কাছে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বৃথা আত্মপ্রশংসায় আমাদের স্ফীত হওয়া উচিত নয়। আদালতের উচ্চাসনে কিংবা আইনজীবীর

গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়ে কেবলমাত্র আইনের জ্ঞানকেই সারবস্তু বলে গণ্য করলে চলবে না।··· মহৎ চিন্তা, মহৎ কাজ আর অমর রচনা—এই মানবজীবনের আদর্শ। বঙ্কিম, মধুসূদন পৃথিবীকে এই তিনটি মহৎ জিনিষ দান করে গিয়েছেন···বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষায় তাঁরা এর প্রমাণ রেখে গেছেন।···তাই তাঁরা মৃত হয়েও আজ জীবিত রয়েছেন। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেদিন বিচার করবে সেদিন তারা সংকীর্ণচেতা কোন সমাজ-সংস্কারক কিংবা ভাগ্যান্বেষী কোন রাজনৈতিক নেতাকে ভারতের স্রষ্টা বলে স্বীকার করবে না—স্বীকার করবে সেই মহানচেতা বাঙালীকে যিনি নিঃশব্দে নিভৃতে প্রকৃতিব মত নিঃস্বার্থ হৃদয়ে পরম সৃষ্টির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন···যিনি একটি ভাষা, সাহিত্য ও জাতি গড়ে গিয়েছেন—সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে।'

অরাবন্দের মত বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠিক ঠিক বুঝেছেন আর কোন্ বাঙালী বা ভারতবাসী? তা যদি বুঝতেন তাহলে আজকের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে কি মহাদুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিতো?

রাজা রামমোহনের পর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্য দৃষ্টি এবং জাগরিত অন্তঃকরণ ঘুমন্ত ভারতবাসী—আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে জাগরিত করতে এবং তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে যত্নশীল হ'ে।। তার ফলও ফললো পরবর্তী কালে। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হলো শ্রীরাম-কৃষ্ণ, বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং কর্মপ্রেরণা।

কিছুদিন পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বিরোধিতা করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন অরবিন্দ। সেগুলি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট কবলো।

এ ছাড়া তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র সমালোচনা করে লেখেন যে, কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের জন্যেই এই নীতি। এতে করে কোটি কোটি নিরন্ন দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকের কোন উপকারই হবে না। দেশে এখন এমন

আন্দোলনের প্রয়োজন যাতে দরিদ্র জনসাধারণের উপকার হয় এবং সেই সঙ্গে শাসকগণের চৈতন্যোদয় হয়।

অরবিন্দের এই ধরণের চিন্তা প্রকাশিত হওয়ার আগেই আর একজন বাঙালীর মনে এইপ্রকার চিন্তার উদয় হয় এবং তিনি তা লিখে প্রকাশ করলেন। তাঁর নাম চন্দ্রশেখর সেন। তিনি লিখলেন, 'যতদিন না আমরা বুঝতে পারি এবং জনসাধারণকে বোঝাতে পারি ন্যাশনাল কংগ্রেস কি? ততদিন লোক প্রচারিত কোন উত্তর পেলেও আমরা নীরব হবো না। মনে মনে জিজ্ঞেস করবো—'ন্যাশনাল কংগ্রেস কি?' কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বন্ধুগণ কি আমাদের প্রশ্নে কর্ণপাত করবেন না? যদি তাঁরা আমাদের প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর বলে উপেক্ষা করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝবো, ন্যাশনাল কংগ্রেস অর্থে পাশ্চাত্য শিক্ষিতের প্রদর্শনী বা পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মহামেলা।'

বাস্তবিক পক্ষে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে আবেদন-নিবেদন করে বা সহৃদয়তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ভারতের স্বরাজ লাভ হবে না একথা মহাবিপ্লবী অরবিন্দ এবং তাঁর সমসাময়িক ভারতের বিপ্লবমনা যুবকগণ বুঝেছিলেন। তারা চেয়েছিলেন অন্য পথে ভারতের স্বরাজ লাভের সাধনা। সেই সময়ে অরবিন্দের মনোভাব এবং ভবিষ্যৎ কর্মের কথা ব্যক্ত করে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন: 'স্বরাজ ভারতের কাম্য, কিন্তু সেই স্বরাজ আসবে কোন পথে? নব্য রাজনীতিক দল দীর্ঘদিন অনুসৃত আবেদন-নিবেদনের পথ বর্জন করে সন্ত্রাসবাদের পথ না মাড়িয়েও এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন। তা হলো অসহযোগ বা বয়কট বা নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথ। এর মর্মকথা হলো ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে চালাতে হবে সর্বাঙ্গীন অসহযোগ। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এই নূতন দর্শনের নাম দিয়েছিলেন 'Doctrine of Passive Resistance' বা নিরস্ত্র (নিষ্ক্রিয় নয়) প্রতিরোধ নীতি। নিরস্ত্র ও অসহায় ভারত-

বাসীর পক্ষে প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ শাসকের সঙ্গে সামরিক অভিযানে জয়লাভের আশা দুরাশামাত্র। এই গভীর সত্য উপলব্ধি করেই তাঁরা নিরস্ত্র ও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী জাতির সামনে উপস্থাপিত করেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে হলে চাই জনসাধারণের ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রামী মনোভাব। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠনেব আবেদন তাই নব্য রাজনৈতিক দলেব নেতারা জানালেন বারংবার। কেবল 'স্বরাজ' 'স্ববাজ' বলে চীৎকার করলেই স্বরাজ এসে দেখা দেবে না। স্ববাজ লাভের পূর্বে স্ববাজকামী মানুষ সৃষ্টি প্রয়োজন। নির্ভীক ও স্বার্থত্যাগী সৈনিক ছাড়া স্বাধীনতা-যুদ্ধ ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবনেব সবস্ব ত্যাগ করেই মহত্তম লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। ১৯০৭-৮ সনে যখন দেশের ভিতরে সবকারী নির্যাতন উত্তরোত্তর বেড়ে চলে ও জাতিব মনে দ্বিধা, সংশয় দেখা দেয়, তখন বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের অগ্নিগর্ভ বাণী জাতীয় জীবনে এক নূতন আশা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

অরবিন্দের স্বরাজ সংগ্রাম ছিল হৃদয়ের গভীরতম উপলব্ধিতে। তিনি ভারতীয় ভাবধারায় সিক্ত করে সংগ্রামেব আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় ত্যাগ, সংযম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম শক্তি নিহিত আছে তাই ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। তার জন্যে বাইবের জিনিষ—বিদেশী চিন্তা ও ভাবধাবার বিশেষ প্রয়োজন হবে না। অবশ্য তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে মনে-প্রাণে স্থান দিয়ে গেছেন। তিনি এও বলেছেন যে অসহযোগ আন্দোলন নিষ্ফল হলে বা শক্তিহীন হলে প্রয়োজন হবে সশস্ত্র বিপ্লবের। তাঁব এইপ্রকার ভাবধারা তারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমাব ঘোষ অনুসরণ করেন। পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধী অরবিন্দেব ভাবধারাকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বরাজ সংগ্রামের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ কোথায় তা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র পাল। 'বন্দে

মাতরম্' পত্রে অরবিন্দ লেখেন : 'The return to ourselves is the cordinal feature of the national movement. It is national not only in the sense of political assertion against the domination of foreigners, but in the sense of a return upon our old national individuality.'

বিপ্লবী এবং মনিষী বিপিন পালও লিখলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "The Bed-Rock of Indian Nationalism" প্রবন্ধে এই একই কথার প্রতিধ্বনি। তিনি লিখলেন, ভারতের জাতীয় আন্দোলন কেবলমাত্র আর্থিক বা রাষ্ট্রিক আন্দোলন নয়। এর লক্ষ্য আরও মহৎ, উদ্দেশ্য আরও বৃহৎ।

বিপিনচন্দ্র পাল এই আন্দোলনকে 'আধ্যাত্মিক আন্দোলন' বলে মনে করতে লাগলেন।

'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় আব একটি প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখলেন 'যে দেশের শাসনতন্ত্র দেশবাসীর সম্মতি নিয়ে রচিত হয়নি সেই শাসনতন্ত্রের কাছে আবেদন প্রার্থনা অথবা নিয়মানুগ আন্দোলন নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।'

কংগ্রেসকে সমালোচনা করে 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে মহাবিপ্লবী অরবিন্দ আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার নাম 'পুরাতনের জন্য নতুন প্রদীপ'। এতে অরবিন্দের মনের যে বিপ্লবাত্মক চিন্তার প্রকাশ ঘটলো তা অনেকে সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মারাঠী নেতা মহাদেও গোবিন্দ রানাডে। যাতে তিনি ইংরাজদের সুনজর হতে বঞ্চিত হন এই আশঙ্কায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে একটি পত্র লিখে জানালেন, এখন থেকে অরবিন্দের কোন লেখা যেন আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করা না হয়। এর দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

রানাডের কথামত অরবিন্দের প্রবন্ধ আর ইন্দুপ্রকাশ কাগজে প্রকাশিত হলো না।

এর জন্যে অরবিন্দ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী 'বন্দে মাতরম' গানে যে শক্তির প্রকাশ দেখেছেন এবং তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন তার কাছে এই তুচ্ছ আঘাত সিন্ধুর তুলনায় বিন্দু মাত্র। এই মহাবিপ্লবী পুরুষসিংহ রাণাডের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে নিজের কর্ম করে যেতে লাগলেন। তাঁর কাছে প্রথম সত্য বস্তু এবং লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বর। তারপর দেশজননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের গুরু দায়িত্বভার। তিনি এর আগে পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিপ্লবী মহামানবের বাণী ও জীবনী পাঠ করেছেন। তা থেকে তিনি সাহস পেলেন। এর পর এলো তরুণ সন্ন্যাসী ও বিপ্লবী বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্মের বিজয় গৌরব স্থাপন করে সবেমাত্র স্বদেশে ফিরেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে তিনি শত সহস্র অভিনন্দন পত্র পাচ্ছেন। তার উত্তরে তিনি দেশবাসীকে শোনাচ্ছেন জাগরণের মন্ত্র। বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করছেন : হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্যে নয় ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

'হে বীর সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে সদর্পে ডেকে বলো—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের

বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ করো।'

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এমন দেশাত্মবোধক বাণী পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দেশে কোন মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা সাধারণত নিজের মুক্তির জন্যে সদা ব্যস্ত থাকেন। পরের কথা তাঁরা চিন্তা করেন না বা পরের সমস্যার সমাধানের জন্যে অযথা মাথা ঘামান না। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হলেন তার একমাত্র ব্যতিক্রম। এর কারণও আছে। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি নিজের মুক্তির কথা সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখে দেশের মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন।

স্বামীজীর বাণী এবং কার্য্যপ্রণালী অরবিন্দের জীবনকে প্রভাবিত করলো। তিনি জাতিকে তার গভীর সুপ্তির কোল থেকে জাগরিত করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় অরবিন্দের জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৮৯৪ সালে পুণার চীফ্ কনেষ্টবল হত্যার অপরাধে চারজন যুবককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তারা কারাগারে অসম্ভব রকমের নির্য্যাতন ভোগ করতে লাগলো।

অরবিন্দ কারাগারগুলির সংশোধনের জন্যে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেটি প্রকাশিত হলো 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে।

রচনাটি তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের নজরে পড়লো। তিনি অরবিন্দের মৌলিক চিন্তাধারা দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহামতি রাণাডেকে জানালেন, আমি অরবিন্দের কারাসংস্কার প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি।

আমি চাই তাঁকে অতি শীঘ্র কারাসংসারের কাজে নিযুক্ত করা হোক। আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

গভর্ণর জেনারেলের কথামত বিচারপতি রাণাডে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অরবিন্দের কাছে প্রস্তাব এলো, আপনি কারাসংস্কারের কাজে যোগ দিতে রাজী আছেন কি? আপনার কারাসংস্কার প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর অত্যন্ত খুশী হয়েছেন।

বুদ্ধিমান অরবিন্দ বিচারপতি রাণাডের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে জানালেন, আপনি দয়া করে ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে জানাবেন যে আমি তাঁর মনোমত কাজে যোগ দিতে অনিচ্ছুক। তিনি যে আমার লেখা কারাসংস্কার নামক প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দিত হয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অরবিন্দ ভেবে দেখলেন, একবার যদি সরকারী কাজে যোগদান করেন তাহলে তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারায় আসবে প্রচণ্ড আঘাত। তাছাড়া তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর পক্ষে ইংরাজ শাসনের অধীনে গোলামী করা কিভাবে সম্ভবপর হবে?

বিপ্লবী অরবিন্দের মনে এই চিন্তাই বড়লাট বাহাদুরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ হলেও অরবিন্দ কিন্তু নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি বরোদা রাজকলেজের কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করলেন এবং তার নাম দিলেন 'তরুণ সমিতি'।

এই সব তরুণদের কাছে তিনি ভারতমাতার পরাধীনতার দুঃখ প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতেন। তিনি বলতেন, আমাদের বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষ বহুদিন হতে বিদেশী শাসকদের অধীনে রয়েছে। বিদেশী শাসকরা কেবল শোষণ করেছে, ভারতবর্ষের উন্নতির দিকে নজর দেয়নি। আর যেটুকু দিয়েছে তা নিজেদের স্বার্থে।

তিনি আরও বললেন, এখন থেকে ভারতবর্ষকে ভাবতে হবে দেশজননী রূপে। আমরা গর্ভধারিণী মার প্রতি যেমন ঋণী থাকি তেমনি ঋণী আছি এই মাটির মা ভারতজননীর প্রতি। সুতরাং পুত্র হয়ে তার দুঃখদুর্দশা দূর কববো না এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আমাদের এখন উচিত সাধ্যমত চেষ্টা করা যাতে ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হতে পারে।

অরবিন্দের এইসকল দেশাত্মবোধক বাণী তরুণচিত্তে অভূতপূর্ব সাড়া জাগালো। তারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে মনস্থ করলো। সেই সঙ্গে দেশপ্রেমিক অরবিন্দকে তাদের প্রিয় নেতা রূপে ভাবতে লাগলো।

এইসময় মহারাষ্ট্রের প্রিয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলক 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে প্রকাশিত অরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনিও ছিলেন অববিন্দের মতের অনুসরণকাবী। তাঁর কতকগুলি ছাত্র মিলিত হলো অববিন্দের প্রবর্ত্তিত তরুণ সমিতির সঙ্গে। তারা দলবদ্ধ ভাবে কংগ্রেসের তোষণ নীতিব বিরোধিতা করতে লাগলো।

ঠিক এই সময় মহারাষ্ট্রে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। তার নাম 'হিন্দুধর্ম সংঘ'। এই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা হলো দু'জন মহারাষ্ট্রীয় যুবক। ওরা দুই ভাই। একজনেব নাম দামোদব চাপেকার, অন্যজনের নাম বালকৃষ্ণ চাপেকার।

ওরা একদিন গণপতি ও শিবাজী উৎসব আরম্ভ করলো।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তিলক তাব সম্পাদিত 'কেশবী পত্রিকায় শিবাজীব বাণী প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছেঃ 'গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপন আচার্য্য ও জ্ঞাতিদিগকে বধ করতে উপদেশ দিয়েছেন। ফললাভের প্রত্যাশা না করে কেউ যদি নিষ্কামভাবে কাজ কবে তাহলে কোন দোষ হয় না। যদি আমাদের ঘরে চোর ঢোকে আর তাকে তাড়াবার মত শক্তি আমাদের না থাকে

তবে বিনা দ্বিধায় তাকে ঘরে বন্ধ করে পুড়িয়ে মারা আমাদের উচিত। ভগবান হিন্দু সাম্রাজ্যের তাম্রশাসনে খোদিত সনদ দ্বারা বিদেশীয়কে আমাদের ওপর রাজত্ব করবার কোন অধিকার দান করেননি। মহারাজ শিবাজী বৈদেশিক শাসকগণকে তাঁর জন্মভূমি হতে বহিষ্কারের চেষ্টা করেন।'...('কেশরী'—১৫ই জুন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। সরকারী কর্মচারীরা আসে প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে।

কিন্তু তাদের নির্দয় ব্যবহারে জনসাধারণের মনে বিরক্তি ভাবের প্রকাশ দেখা গেল। আবার ২২শে জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসব আরম্ভ হলো। বিপ্লবী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই জুবিলী উৎসবে যোগদান না করতে মনস্থ করেছিলেন। ফলে অসন্তুষ্ট মহারাষ্ট্রীয়গণের সঙ্গে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের বিবাদ বাধলো। বিবাদ ক্রমশ সংঘর্ষের রূপ নিলো। সংঘর্ষের ফলে মারা গেল দু'জন শ্বেতাঙ্গ। তাদের একজনের নাম র‍্যাণ্ড অন্যজনের নাম আয়ার্ষ্ট। ওরা হলেন সরকারী কর্মচারী। প্লেগরোগাক্রান্ত রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার ভার ওদের হাতে ছিল।

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট নিহত হয়েছে এই মর্মান্তিক সংবাদ এসে পৌঁছালো শাসকদের কাছে। তারা মনে প্রাণে বালগঙ্গাধরকে সন্দেহ করতে লাগলো। ভাবলো, 'কেশরী' পত্রিকায় শিবাজী প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তিলক তা রাজদ্রোহমূলক। তাঁর উস্কানি পেয়েই উত্তেজিত জনতা শ্বেতাঙ্গ হত্যায় লিপ্ত হয়েছে। এই কারণে ইংরাজ শাসক দেড় বছরের জন্যে তিলককে কারাবাসের দণ্ড দিলো।

মহারাষ্ট্রের মহামান্য নেতা তিলক বন্দী হয়েছেন এই দুঃসংবাদ চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার ফলও হলো বিষময়। সারা মহারাষ্ট্রের লোক ক্ষেপে উঠলো। তারা ব্যাপকভাবে চাঁদা আদায় করতে লেগে গেল। সরকারের ঐ প্রকার দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে লণ্ডনে অবস্থিত প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করলো।

কিন্তু তাতে কোন সুফল ফললো না। ওদিকে চাপেকার ভ্রাতাদের ওপর সন্দেহ করতে লাগলো ইংরাজ শাসক। ভাবলো, তারাই র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে হত্যার মূলে। তারা ষড়যন্ত্র করে এই দু'জন ইংরাজকে হত্যা করেছে।

বিচার হলো চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের। বিচারক তাদের ফাঁসির হুকুম দিলেন।

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হলে মহারাষ্ট্রবাসীরা দ্বিগুণ মাত্রায় ক্ষেপে উঠলো।

সরকারের ঐসব দমননীতিকে উপলক্ষ করে ডাক্তার পরাঞ্জপে তাঁর সম্পাদিত 'কাল' পত্রিকায় একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটির নাম 'দেশসেবকের অপরাধ'।

ঐ প্রবন্ধটি পরে আবার 'কেশরী' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক নাচু ভ্রাতারা পুনঃ প্রকাশ করলেন তাঁদের পত্রিকায়।

ফল হলো বিরূপ। ইংরাজ সরকার 'কাল' ও 'কেশরী' পত্রিকার ওপর ক্ষিপ্ত হলেন। বিচার হল সম্পাদক মণ্ডলীর।

বিচারে পরাঞ্জপে ও নাচু ভ্রাতারা নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন।

তখনকার দিনে বরোদার বিখ্যাত সংগ্রামী মানুষ ছিলেন ঠাকুর সাহেব। তিনি ছিলেন বিপ্লবী। অরবিন্দের মত তিনিও মনে প্রাণে সমর্থন করতেন। ইংরাজদের কাছে খোসামোদ করে স্বাধীনতা অর্জন করার ইচ্ছা তাঁর মনে আদৌ স্থান পায়নি। এই কারণে তিনি একটি সংঘ গড়ে তোলেন তাঁর মনোমত কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে। নাম দিলেন তার 'গুপ্ত সমিতি'।

অরবিন্দ যখন বরোদায় এলেন তখন ঠাকুর সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজস্ব মত বিনিময় করেন। সেই সঙ্গে তিনি অরবিন্দকে অনুরোধ করেন, আপনি যদি আমার পরিচালিত 'গুপ্ত সমিতি'র ভার গ্রহণ করেন তাহলে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে

করবো। আমার ও আপনার উদ্দেশ্য এক। আমরা মিলিতভাবে দেশমাতার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

ঠাকুর সাহেবের প্রাণভরা কথা শুনে আনন্দ পেলেন অরবিন্দ। তিনি স্মিতহাস্যে সম্মতি জানালেন, আচ্ছা আমি আপনার গুপ্ত সমিতির সভাপতি হতে রাজী আছি।

১৮৯৬ সালে অরবিন্দ ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতির সভাপতি হন।

ওদিকে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করায় 'হিন্দুধর্ম সংঘে'র ভারও এসে পড়লো অরবিন্দের ওপর।

এখন থেকে অরবিন্দ 'তরুণ সমিতি' 'গুপ্ত সমিতি' আর 'হিন্দুধর্ম সংঘ' এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করলেন। এত বড় গুরুদায়িত্ব এলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। পরে অবশ্য এই তিনটি সমিতি এক হয়ে যায়। অরবিন্দ একাই এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন এবং পুণা ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী তরুণদের কার্য্যাবলী বেশ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তার মনও বিপ্লবের পথে প্রস্তুত হতে লাগলো। তিনি তরুণদের মনে বিপ্লবের ধ্বনি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে লাগলেন। এসব কাজ তিনি গোপনে এবং সুকৌশলে করতে লাগলেন যাতে করে ইংরাজ শাসকগণ তার প্রতি কোন রকম সন্দেহ পোষণ না করতে পারে।

পুণা ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘটনা এবং সেখানকার নেতাদের বিপ্লবী চিন্তাধারার কথা মনে করে শান্ত হতে পারলেন না অরবিন্দ। তাঁর মন বাংলায় আসবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো। বিশেষ করে বন্দে মাতরম মন্ত্রের সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দেশকে—তাঁর নিজের জন্মভূমিকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে তাঁর মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

এর ওপর আবার তিনি শুনতে পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের

জনসেবামূলক কার্য্যকলাপ। তিনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করে স্বদেশে ফিরেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে এবং তাঁদের অর্থ সাহায্যে ভাগীরথী নদীর তীরে বেলুড় অঞ্চলে গড়ে তুলেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর বাণী ও রচনা পাঠ করেছেন অরবিন্দ। এবার ত'কে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন।

কিন্তু অধীর হলে কি হবে মানুষ যা ভাবে তা সব সময় সফল হয় না। তিনি বাংলায় এসে কি করবেন! তিনি বাঙালী বটে, জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশে কিন্তু মানুষ হয়েছেন বিদেশে—সুদূর ইংলণ্ডে। তাই তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে বা ঐ ভাষায় কেউ কথা বললে বুঝতে পারেন না। 'এমন মানুষ এখন বাংলায় এসে কি করবেন? লোকে শুনলে বলবে কি? বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষা জানে না। ছি! ছি! এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর আছে নাকি!

মহামুস্কিলে পড়লেন অরবিন্দ। কি করবেন এই চিন্তায় দিনরাত কাটাতে লাগলেন। আর তাঁর এই প্রকার দুর্বলতার কথা মুখ ফুটে কারও কাছে প্রকাশ করতেও পারছেন না। বিশেষ করে বরোদার কোন বন্ধু স্থানীয় মানুষের কাছে।

কি করবেন? কার কাছে প্রকাশ করবেন তাঁর মনের একান্ত গোপনীয় কথা?

বাংলা ভাষা তাঁকে শিখতেই হবে। এই ভাষা তাঁর যে মাতৃভাষা। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন এবং মূল্যবান। একে ভুলে আর কতকাল থাকা যায়? ভাষা শিখতে পারলে তবেই দেশজননীর সঙ্গে একাত্ম বোধ করবেন। তার সুখ-দুঃখ ও মনের কথা জানতে পারবেন। জেনে সেইমত কাজ করবেন। মাতৃ-ভাষাই হচ্ছে শক্তি যা স্বাধীনতা সংগ্রামে জোগাবে মৌলিক অনুপ্রেরণা। এই ভাষা আয়ত্ত করলে জানতে পারা যাবে বাংলার নিজস্ব লোকপরিচয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

অনেক ভাবনার পর শেষকালে মনোমত মানুষ খুঁজে পেলেন অরবিন্দ। তিনি হচ্ছেন যোগেন্দ্রনাথ বসু। সম্পর্কে মাতুল—আপনজন।

এই যোগেন্দ্রনাথ বসু অরবিন্দের প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং তার বিকাশের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ জানান।

অরবিন্দ লিখলেন মাতুলকে, 'শ্রদ্ধেয় মামাবাবু, আমি বাংলা ভাষা শিখতে চাই। আমাকে বাংলা ভাষা শেখাতে পাবরে এমন একজন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

পত্র পাঠ করার পর যোগেন্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন, কাকে এখন পাঠানো যায় বরোদায়? ভাগনে আমার খুবই যোগ্য ব্যক্তি। সে বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে। স্বদেশে এসেও অনেক পড়াশুনো করেছে ও এখনো করছে। এ হেন মানুষের কাছে সাধারণ নিরীহ শিক্ষককে পাঠালে তো চলবে না।

কয়েকদিন ধরে বিষয়টি চিন্তা করার পর তার স্মরণ পথে দেখা দিল জনৈক যোগ্য ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়।

যোগেন্দ্রনাথ বসু দীনেন্দ্রকুমারকে বললেন, আমার ভাগনে বরোদায় রয়েছে। সে বাংলা ভাষা শিখতে চায়। আমার কাছে চিঠি লিখেছে তার জন্যে একজন যোগ্য শিক্ষক পাঠাতে। আমি আপনার ওপর সেই কাজের ভার অর্পণ করছি। আপনিই প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি।

যোগেন্দ্রনাথের কথা শুনে বিচলিত হলেন সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার। তিনি বললেন, শুনেছি আপনার ভাগনে অত্যন্ত গুণী-জ্ঞানী মানুষ। তাঁর তুলনায় আমার আর কিইবা যোগ্যতা আছে। আমি তো বাংলা ভাষায় পণ্ডিত নই, দু' কলম লিখতে পারি মাত্র।

যোগেন্দ্রনাথ বললেন, তা হোক। আপনি যান। আপনার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে।

এরপর দীনেন্দ্রকুমার আর কোন আপত্তি করলেন না। তিনি নির্দিষ্ট দিনে রওনা হলেন বরোদা অভিমুখে। মনের মধ্যে কিন্তু নানা প্রকার ভাব এসে উপস্থিত হতে লাগলো। অরবিন্দকে দেখার আগে ও পরে তাঁর মনে কি রূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার একখানি সুন্দর নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর জনৈক জীবনীকার:
'…যোগেন্দ্রবাবু সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে ভাগিনেয়ের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বরোদায় পাঠাইলেন। ছাত্রের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা দীনেন্দ্রবাবু লোকপরম্পরায় পূর্বেই কিছু শুনিয়াছিলেন এবং এইরকম একজন কেমব্রিজের ডিগ্রী উপাধিধারীর শিক্ষকতা করার কথা শুনলে ভয় পাইবারই বিষয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও চিন্তা করিলেন যে এমন একটি ছাত্রের শিক্ষকতা করাও সৌভাগ্যের বিষয়। এই সাহসে ভর করিয়া ভগবানের নাম লইয়া দীনেন্দ্রবাবু বরোদা যাত্রা করিলেন।

'দীনেন্দ্রবাবু ভাবিলেন গিয়া দেখিব ছাত্রটি না জানি কত বড সাহেব—এক আধ বৎসর নহে, রামায়ণের রামচন্দ্রের চৌদ্দ বৎসর বনবাসের মতই যে মানুষটি সাত বৎসর বয়স হইতে পুরা চৌদ্দ বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া লেখাপড়া কবিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন পাকা সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বরোদায় আসিয়া ছাত্রটিকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। আসিয়া দেখিলেন যে যাঁহার শিক্ষকতা করিতে তিনি আসিয়াছেন সেই শ্রীঅরবিন্দ বিলাতী সাহেবও নহেন, এমন কি দেশী সাহেবও নহেন। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত মানুষটি একেবাবে খাঁটি বাঙালী। বেশভূষা, আচার-ব্যবহার একেবারেই বাঙালীর মতন। মাথায় বড় বড় চুল, পরণে বোম্বাই মিলের মোটা ধুতি; পায়ে নাগরা জুতা—একেবারে শান্তশিষ্ট নিরীহ বাঙালী।'…

অরবিন্দকে দর্শনের পর দীনেন্দ্রকুমার তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ "অরবিন্দ প্রসঙ্গ"-তে মন্তব্য করেছেন: 'দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া

কেহ আমাকে যদি বলিত "ইহাই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী" তাহাতে আমি বিস্ময় বোধ করিতাম না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলাম।'

কেমব্রিজের ডিগ্রীধারী হয়েও অরবিন্দ দীনেন্দ্রকুমারের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলা ভাষা শিখতে লাগলেন। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে লাগলেন তদানীন্তন দিকপাল কবি ও সাহিত্যিকদের কালজয়ী রচনা পাঠ করে। প্রথমে তিনি পাঠ করলেন কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। তারপর দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' গ্রন্থ। তারপর নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হলেন। অরবিন্দের কাছে সব চেয়ে ভাল লাগলো বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী।

অরবিন্দের শিক্ষক দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'অরবিন্দ স্বামীবিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।'

এই সময় অরবিন্দ অল্পাহার করতেন এবং সাধারণ বেশভূষা পরতেন। রাতদিন কেবল বই নিয়ে থাকতেন। তাঁর পাঠতৃষ্ণা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন দীনেন্দ্রকুমার। তাঁর মেধাশক্তি ছিল অপূর্ব। একবার যে জিনিষ পড়তেন তা সহজে ভুলতেন না।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী পাঠ করার পর তিনি তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। সেইসঙ্গে তিনি স্থির করলেন বাংলায় ফিরে গিয়ে আনন্দমঠের সাধুর মত নিষ্কাম চিত্তে দেশমাতার সেবা করবেন। এই সময় তিনি 'ভবানীমন্দির' নাম দিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা

করেন। দেবী ভবানীর স্তব ও পূজাপদ্ধতি ঐ পুস্তকে লেখা হলো। 'আনন্দমঠের' আদর্শে একটি সন্তানদল গঠন করে দেশের কাজ করার ইঙ্গিত দেন 'ভবানীমন্দির' পুস্তিকায়। অর্থাৎ বাংলায় এসে ভাবীকালে তিনি যে কাজ করতে চান তারই একটি ছক তৈরী করেন 'ভবানীমন্দির' পুস্তিকায়।

অরবিন্দ যখন বরোদার রাজ কলেজে পড়াতেন তখন ছাত্রদের সঙ্গে দেশের মুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর দু'জন সহকর্মী অধ্যাপক এস, সি, মুখার্জি ও মন্নুভাই দেশাইও ছাত্রদের কাছে দেশের অবস্থা বর্ণনা করে বক্তৃতা দিতেন। তাই বলে তাঁরা মূল পাঠ্য বিষয় বাদ দিয়ে কিছু করতেন না। পড়াবার সময় পড়াতেন। পড়ানো শেষ হলে তারপর আলোচনা করতেন দেশের সমস্যা নিয়ে। ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে অরবিন্দের মুখে দেশের কথা শুনতো। তাঁর তখনকার দিনে বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম হচ্ছেন বিখ্যাত লেখক ডকটর কে, এম, মুন্সী।

কাগজে প্রবন্ধ লেখা বন্ধ হলেও নীরবে বসে রইলেন না বিপ্লবী অরবিন্দ। বরোদার 'ওঙ্কার থিয়েটার' হলে 'স্বদেশ প্রেমের' বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর এই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা শোনার জন্যে বহু লোক আসতো। তখনকার একটি সুন্দর চিত্র অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর জনৈক জীবনীকারঃ '...দিনের পর দিন সেইসব বক্তৃতার ভাষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল, তাঁহার চিন্তা স্বচ্ছতর হইয়া উঠিল। নিস্তরঙ্গ নদীতে যখন বন্যার ঢল নামে, তখন তাহা যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া স্ফীতকলেবর হইয়া কলোচ্ছ্বাসে দুই তট পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়, শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশপ্রেমের চিন্তার শান্ত নদীতে যখন বাক্যের প্লাবন নামিতে সুরু করিল, তখন সেই চিন্তার উদ্বেল তরঙ্গ তাঁহার অন্তরের দুই তট পরিপ্লাবিত করিয়া দিল।'...

দেশের লোক তাঁর বক্তৃতা শুনছে এইরূপ ভেবে আনন্দে গদগদ

হলেন অরবিন্দ। অবশ্য আত্মপ্রশংসা বিমুখ ছিলেন তিনি। দেশের জনগণ জাগতে আরম্ভ করেছে এই দৃশ্য দেখেই তিনি আনন্দ পেলেন।

এবার তাঁর কাজের গণ্ডী আরও বিস্তৃত করার উপায় স্থির করলেন। তিনি বাংলায় আসতে মনস্থ করলেন কিন্তু যত তাড়াতাড়ি আসবার জন্যে ইচ্ছা করেছিলেন তত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব হলো না।

তার কারণও ছিল। তাঁর পিতৃবন্ধু ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ সময় বরোদায় যান। তিনি বাংলাদেশে থাকতে অরাবন্দের প্রতিভার কথা শুনেছিলেন। বরোদায় এসে অরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মুগ্ধ হলেন। তাঁর রচনাও কিছু কিছু পাঠ করলেন। তার মধ্যে ইংরাজী ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদও পাঠ করলেন।

অরবিন্দের অপূর্ব রচনাগুণ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন রমেশ-চন্দ্র। এর আগে তিনিও ইংরাজিতে মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন এবং তা প্রকাশ করার জন্যে লণ্ডনের জনৈক প্রকাশক নিয়েছেন। তাই তিনি অরবিন্দকে বললেন, অরবিন্দ, আমিও এ অনুবাদ করেছি আর লণ্ডনের Everyman's Library কে ওটি প্রকাশের জন্যে পাঠিয়েছি। এতদিনে হয়ত তার কতকটা ছাপাও হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমার এই অনুবাদ এত সুন্দর হয়েছে যে আমার অনুবাদ বের করতে আমি লজ্জা বোধ করছি।

রমেশচন্দ্রের কথা শুনে কিছুমাত্র দুঃখিত হলেন না অরবিন্দ। আবার তাঁর মুখে প্রশংসা শুনেও গর্বিত হলেন না। শান্তভাবে বললেন, এসব আমি ছাপাবার উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনি। আমার জীবনকালে এসব ছাপা হবে না।

রমেশচন্দ্র বললেন, সেকি কথা! এত সুন্দর জিনিষ তুমি না ছেপে রেখে দেবে বাক্সবন্দী করে!

অরবিন্দ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

পরে অরবিন্দের এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হবার আগেই পুলিশের হেফাজতে চলে যায়। তিনি যখন আলিপুর বোমার মামলায় অন্যতম আসামী রূপে ধৃত হন সেই সময় পুলিশ তাঁর গৃহে তল্লাসী চালিয়ে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ঐ পাণ্ডুলিপিটিও নিয়ে যায়।

অরবিন্দের এইপ্রকার মহানুভবতার কথা চিন্তা করলে নিমাই পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে যায়।

সংস্কৃত শিক্ষা শেষ করে নিমাই পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রের ওপর একটি টীকা লেখেন।

ঐ সময় ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত রঘুনাথও ন্যায়শাস্ত্রের ওপর একখানি টীকা লিখলেন।

পণ্ডিত রঘুনাথের কথা কে না জানে। তিনি মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের কাছ থেকে ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক জেনে নিয়ে পরে তা কণ্ঠস্থ করেন এবং নদীয়ায় এসে তার প্রচলন শুরু করেন।

নিমাই ও রঘুনাথ দু'জনে বন্ধু ছিল। উভয়ের মধ্যে বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল।

একদিন গঙ্গার ধারে বসে রঘুনাথ নিমাইকে তাঁর রচিত ন্যায়-শাস্ত্রের টীকা দেখালেন।

নিমাইও রঘুনাথ পণ্ডিতকে তাঁর রচিত টীকা পাঠ করে শোনালেন।

ঐ টীকা শোনার পর বিস্ময়ের সীমা রইলো না রঘুনাথের।

তিনি বললেন, নিমাই। তোমার এই টীকা আমার টীকার চেয়েও ভাল হয়েছে আর এর প্রচলন হলে লোকে আমার টীকা পড়বে না।

উত্তরে নিমাই বললেন, সে কি কথা। তুমি নদীয়ার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক—নদীয়ার পণ্ডিতসমাজের গৌরব তুমি। তোমার টীকাই প্রচলিত হবে।

এই কথা বলার পর নিমাই রঘুনাথের সামনে তাঁর লেখা টীকা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন।

রমেশচন্দ্রের কথামত অরবিন্দ আরও কিছু দিন বরোদায় থেকে যান। পরে তাঁর পরামর্শে মহারাজা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্রকে তাঁর রাজ্যে দেওয়ানের পদ দেন। বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে একাধিক মানুষের দেখা হয়। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন চিত্রশিল্পী শশীকুমার।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেল। ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভাইয়েদের যে দু'জন লোক ধরিয়ে দিয়েছিল গুপ্ত সমিতির কয়েকজন সভ্য সেই দু'জনকে হত্যা করে। এর ফলও হলো মন্দ। চারজন যুবকের মৃত্যুদণ্ড ও একজনের দশ বছর কারাদণ্ড হলো। এই ঘটনার দ্বারা অরবিন্দ বুঝতে পারলেন যে দেশের আবহাওয়া কোনদিকে বয়ে চলেছে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। অন্তরের বিক্ষোভ গোপন রাখলেন।

বরোদায় থাকার সময় অরবিন্দ নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন। যোগের মাহাত্ম্য জেনে নিয়ে নিয়মিত ভাবে যোগাভ্যাসে মন দেন।

কিন্তু কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেই তো যোগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ বা যোগী হওয়া যায় না। কোন যোগীর সাহচর্য্যে থেকে এবং তাঁর পরামর্শ নিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে যোগের পথে চলা দরকার। অরবিন্দ তেমন যোগী পুরুষদের সন্ধান করতে লাগলেন।

কথায় আছে না, যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি। অতি সত্বর তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যোগীদের সন্ধান গেলেন। তাঁরা হলেন গুজরাটের পরমহংস ইন্দ্রস্বরূপ মহারাজ, মালাবারের মাধবদাস স্বামী এবং নর্মদাতীরের চান্দবের গঙ্গানাথ পাহাড়ের জনৈক সাধু। এঁদের কাছ থেকে অরবিন্দ যোগের তত্ত্ব ও ক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এই সকল যোগীরা বরোদায় এসে অরবিন্দকে যোগসাধনায় সাহায্য করেন।

প্রথম যোগীর কাছ থেকে অরবিন্দ যোগমাহাত্ম্য শোনেন।

দ্বিতীয় যোগীর কাছ থেকে শিখে নেন যোগাসন পদ্ধতি এবং তৃতীয় যোগী শেখান যোগাভ্যাস।

এই তিন জন যোগী ছাড়া আর একজন যোগী অরবিন্দকে যোগধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেন।

এই সময় অরবিন্দ চান্দোসির গঙ্গানাথ পাহাড়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার নাম ভারতী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যুবকদের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করা।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে দেওঘরে ঋষি রাজনারায়ণ বসু পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর আগে তিনি কঠিন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। এই সময় সুদূর বরোদা হতে অরবিন্দ দেওঘরে আসেন তাঁর দাদামশাইকে দেখতে। অসুস্থ অবস্থায় রাজনারায়ণের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেরও দেখাসাক্ষাৎ হয়।

ঋষি রাজনারায়ণের মধ্যে একসময় বিপ্লবী মনোভাব দানা বেঁধে উঠেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কয়েকটি যুবককে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে বিপ্লব করার জল্পনা-কল্পনা করেন। তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। উপনিষদের আলোচনা করতেন এবং ইংরাজী ভাষায় তার অনুবাদও করেন। তিনি ছিলেন ঘোর অবতার বিরোধী

দৌহিত্র অরবিন্দের মনে দাদামশাইয়ের প্রথমোক্ত দুটি গুণ বর্তমান ছিল। প্রথমটি হচ্ছে বিপ্লবী মন আর দ্বিতীয়টি বৈদান্তিক আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস।

যৌবনে প্রতিটি নর-নারীর জীবনে প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়। একজন অন্যজনকে কাছে পেতে চায়। দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারে প্রবেশ করে। যুবক অরবিন্দের জীবনেও প্রেমের প্রথম

প্রকাশ ঘটে যখন তিনি লণ্ডনের কলেজে ছাত্র ছিলেন। সেইসময় এডিথ ও এসটেলি নামে দুটি ইংরাজ তরুণীর প্রেমে পড়েন এবং তাদের উদ্দেশ্য করে ইংরাজী ভাষায় বহু কবিতা লেখেন।

এডিথকে বলেছিলেন, 'তুমি আমায় চুম্বন কর' Kiss me Edith তারপর বললেন, 'তোমার বুকের মধ্যে আমায় লুকিয়ে রাখ—'

'In thy bosom's snow white walls
Softly and supremely housed
Shut my heart up ;—'

এসটেলিকে বলেছিলেন, 'আমি তোমায় সুখ দেবো, আমার দিকে তাকাও। আমার অন্তর-দুয়ার তোমার জন্যে সর্বক্ষণ খোলা রয়েছে—'

'Turn hither for felicity,
And all these lights are thine and
open doors on thee'... ইত্যাদি।

এরপর অরবিন্দ ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শন পাঠ করে ভারতীয় অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর জীবনে আবার দেখা দিল নতুন দর্শন। তিনি স্থির করলেন, সাধারণ লোকের মত কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত না থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে সন্ন্যাসীর মত ঈশ্বর-উপাসনা এবং দেশজননীর সেবায় নিজেকে যুক্ত রাখবেন। তার ওপর তখন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন তাঁকে গভীর ভাবে আলোড়িত করলো। সুতরাং ছাত্রজীবনে তাঁর মনে যে প্রথম প্রেমের বিকাশ ঘটেছিল তা আর ফলে-ফুলে পরিণতি লাভ করতে পারলো না। তিনি বেশ কিছুদিন প্রেম ও তৎসংক্রান্ত বিবাহ ব্যাপার ভুলে গেলেন। গভীর পড়াশুনোর মাঝে মনকে সংযুক্ত রাখলেন।

কিন্তু তাঁর মন বেশীদিন এই কাজে নিযুক্ত রইলো না। মাঝখানে তিনি বিয়ে করার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, তিনি বিয়ে করতে চান। উপযুক্ত পাত্রী প্রয়োজন।

পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। নিষ্ঠাবান হিন্দু ভুপাল বসুর কন্যা

মৃণালিনী ইতোমধ্যে অরবিন্দের গুণের পরিচয় পান এবং তাঁকে বিয়ে করার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ভুপাল বসুর বন্ধু ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু। তিনি সংবাদপত্রে পাত্রীর অনুসন্ধানের খবর দেখে বন্ধু ভুপাল বসুকে জানান।

ভুপাল বসু রাজী হয়ে গেলেন।

গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে অরবিন্দ মৃণালিনীকে দেখেন। কন্যা দেখে পছন্দ হয়ে গেল।

অরবিন্দ ছিলেন ব্রাহ্ম। তিনি ব্রাহ্ম কন্যাকে বিয়ে করতে পারতেন কিন্তু করলেন না। কারণ এর আগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্ম কন্যা অপেক্ষা হিন্দু কন্যাদের অধিকতর সৌন্দার্য্যময়ী এবং গুণান্বিতা বলে চিত্রিত করেছেন। তাই অরবিন্দ হিন্দু কন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর জন্যে তাঁকে হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে হিন্দু হতে হলো। ওদিকে ভুপাল বসু বিলেত গিয়েছিলেন বলে তাঁকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

শ্বশুর-জামাই উভয়েই প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সম্পূর্ণ হিন্দু রীতিতে বৈঠকখানায় ভাড়াটে বাড়ীতে বিয়ে হলো।

অরবিন্দের যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়েস ছিল ২৯ বছর আর স্ত্রীর বয়েস ১৫। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলের শেষাশেষি বিয়ে হয়।

বিয়ের ঠিক পরেই অরবিন্দ সস্ত্রীক দেওঘরে যান। তারপর নৈনিতালে কিছুদিন থেকে আবার বরোদায় চলে যান।

অরবিন্দের স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে আমরা যে ফটো দেখি তা নৈনিতালে থাকার সময় তোলা হয়েছে।

বিয়ের ঠিক ১৭ বছর পর রাঁচিতে বাপের বাড়ীতে অরবিন্দের যোগসাধনা করবার সময় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন মৃণালিনী।

পরে ভুপাল বসু এবং তাঁর সহধর্মিণী অরবিন্দের যোগসাধনায় দীক্ষালাভ করেন।

অরবিন্দ যখন বিয়ে করেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা ও আসাম সফর করছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতা গেলেন লণ্ডনে তাঁর মেয়ে স্কুল পরিচালনার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে।

ওদিকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। তার সভাপতি হলেন নারায়ণ চন্দ্রাভর্ক।

এইসময় চন্দ্রাভর্ককে ইংরাজ সরকার দারুণ প্রলোভন দেখালেন। তাঁকে হাইকোর্টের জজ করে দিলেন।

চন্দ্রাভর্কও তাতে খুশী হলেন। তিনি খালি পায়ে কংগ্রেস সভাপতির আসন হতে উঠে জজের আসনে গিয়ে বসলেন।

কংগ্রেস সভাপতির আসনে বসে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা আদৌ মনঃপূত হলো না অরবিন্দের।

মিঃ চন্দ্রাভর্ক বললেন, ভারতবর্ষে পর পর দু'টি ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং লর্ড কার্জন এই দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে গত অক্টোবরে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এই দুর্ভিক্ষ ভাইসরয়ের সহানুভূতি উদ্রেক করেছে এবং ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে দেশবাসীর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করেছে। লর্ড কার্জন ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছেন। এই কারণে ভারতীয় কংগ্রেস মহামান্যা বৃটিশ রাজ্ঞীর কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে।

এই গেল লাহোরের অবস্থা। বাংলায় এসে অরবিন্দ দেখলেন, এখানকার অবস্থাও তথৈবচ। এখানকার শিক্ষিত সমাজ বেশ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে। আহার, নিদ্রা আর মৈথুন—জীবের এই তিন ধর্ম অক্লেশে পালন করে চলেছে আর ইংরাজ রাজ সরকারে চাকরী করতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে কোনরকম প্রচেষ্টা নেই। এই উপলক্ষে আগামী-দিনে রাষ্ট্রীক বিপ্লবের যে সঙ্কেত দেখা দিতে পারে সেরকম চিন্তা

শিক্ষিত দেশবাসীর মনে তখনো পর্যন্ত জাগরিত হয়নি।' তারা তমোগুণে জর্জরিত হয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের সেই তমোভাব নষ্ট করতে হবে।

এইরূপ চিন্তার পর অরবিন্দ দেশবাসীর কানে শোনাতে লাগলেন 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র। সেই সঙ্গে ডাক দিলেন বাঙালীকে, হে বাঙালী, তোমরা জাগো। তপস্বী দধিচী একসময়ে নিজের পূতাস্থি দান করেছিলেন দেশকল্যাণের জন্যে। আজ তোমার সেই তপস্বী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রূপে এসে তোমাদের কানে শোনাচ্ছেন 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র। তোমরা জাগো। আর ঘুমিয়ে থেকো না। তোমার দেশজননী আজ অপমানিতা। পরের রাজ্যে নির্বাসিতা এবং শৃঙ্খলিতা। তুমি দেশজননীর সন্তান হয়ে কিভাবে মায়ের অপমান সহ্য করছো? তোমরা জানো জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এভাবে অববিন্দ দেশবাসীর কানে জাগবণের মন্ত্র শোনালেন।

কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্ট হলো ব্যর্থ। এ যেন সেই উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মত।

তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতারাশি অনেকে শুনেও শুনলো না।

অনেকে আবার অরবিন্দের মুখে স্বাধীনতার কথা শুনে বিদ্রূপেব হাসি হাসলো। মুচকি হেসে বললে, হাসালে অরবিন্দ! হাসালে। লণ্ডন থেকে দু'চার পাতা ইংরিজী শিখে এসে কিসব আবোলতাবোল বকছো? তোমার কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে? জানো ইংরাজ কতবড় দুর্দ্ধর্ষ জাতি, পৃথিবীব্যাপী তার রাজত্ব বিরাজমান। তার কত সৈন্য, লোক লস্কর—গোলাবারুদ। তার সঙ্গে শত্রুতা করা কি সহজ ব্যাপার? এ হেন শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র।

অরবিন্দ তাদের এই প্রকার কথায় আদৌ দমলেন না। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, স্বীকার করি ইংরাজ বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান

জাতি। তার ধনবল এবং লোকবল অসামান্য। তবু আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম হবে অসহযোগের মাধ্যমে। আমরা যদি ইংরাজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করি তাহলে ওরা আর বেশী-দিন ভারতবর্ষে টিকতে পারবে না। আপনি এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাবে।

অরবিন্দের এই কথা শুনে আবার হেসে উঠলো শিক্ষিত সম্প্রদায়, তোমার একথা সম্পূর্ণ পাগলামীসুলভ। শক্তিমান ইংরাজ জাতি অসহযোগকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।

অরবিন্দের সিংহকণ্ঠ গর্জে উঠলো, দেখোই না কেন একবার চেষ্টা করে। এদেশ থেকে ইংরাজ তাড়ানো একেবারে অসম্ভব নয়। এত বড় বিরাট দেশে কোটি কোটি ভারতবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় যে কজন ইংরাজ-সৈন্য ও ইংরাজ-শাসক আছে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া একটি মাত্র ফুৎকারেই সম্ভব। এর জন্যে যদি কখনো গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজন হয় তবে তাই করতে হবে।

তিনি আরও বললেন, আজ যদি দেশীয় সৈন্যের মধ্যে দেশাত্ম-বোধ জাগ্রত হয় তাহলে এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করে ভারতকে পরশাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত করা সম্ভব।

কিন্তু শত যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দেশের নেতারা অরবিন্দের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তার জন্যে ভগ্নোৎসাহ হলেন না অরবিন্দ। তিনি আশা রাখলেন, দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে সকলেই তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সাড়া দেবে।

দেখতে দেখতে অরবিন্দের আশা পূর্ণ হলো। অগণিত জনতার একাংশ হতে বেড়িয়ে এলো একদল যুবক। তারা বললে, আপনার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আমরা দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে রাজী আছি।

অরবিন্দ তাদের চোখ-মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, তোমরা পারবে ভারতমাতার দুঃখ দূর করতে ?

যুবকরা বললে, সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

অরবিন্দ তাদের কথা শুনে খুশী হলেন।

এরপর তিনি এলেন মেদিনীপুরে। সেখানে তাঁর দুই মামা জ্ঞান বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন অরবিন্দ। সত্যেন্দ্রনাথ অরবিন্দকে দেশের মুক্তি সংগ্রামে কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। জ্ঞান বসুও দিয়েছিলেন তবে তাঁর তুলনায় সত্যেন বসুর উৎসাহ আরও গভীর এবং ব্যাপক ছিল।

আরও দু' চারজন উচ্চশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকেও উৎসাহ পেলেন অরবিন্দ। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র এবং সরলা দেবী। মেদিনীপুরে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠিত হলো। তার প্রধান কাজ হলো যুবকদের ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা এবং কুস্তি করার দিকে উৎসাহ দেওয়া।

বিয়ের সময় বাংলায় এসে অরবিন্দ দেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রাথমিক কাজ শেষ করে আবার ফিরে গেলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র বরোদায়। তিনি দেখলেন, বাঙালী ঘুমিয়ে থাকলেও তার অন্তরে সুপ্ত রয়েছে জাগরণের বহ্নিশিখা। তাকে একবার জ্বালিয়ে দিতে পারলে তবেই অনেক কাজ করা যাবে। আর বাংলা হচ্ছে ভারতমাতার হৃদ্‌পিণ্ড। বাংলা জাগলেই সারা ভারত আপনা হতে জাগবে।

অরবিন্দ বরোদায় ফিরে গেলেন। তিনি বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেখে বাইরে যতখানি নিরাশ হয়েছিলেন অন্তরে ততখানি হলেন না। কারণ সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের মত মানুষ বাঙালীর হৃদয়ে অপূর্ব সাড়া জাগাচ্ছিলেন। স্বামীজী বাংলার

যুবশক্তিকে ডাক দিয়ে বললেন, 'খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। একে ত এই Dyspeptic (পেট-রোগা) রোগীর দল, তাতে অত লাফালে-ঝাপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে। ঢাক-ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী-ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবি কল্পনাও এ-ছবি আঁকতে হার মেনে যায়। ডমরু-শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম' শব্দে 'দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে।' যে-সব music এ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে-সকল কিছুদিনের জন্যে এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ—দেশের কল্যাণ।'

স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী ঘুমন্ত জাতির কাছে চাবুক স্বরূপ এলো। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও ছিলেন দেশপ্রেমিক। কলকাতায় যখন জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসে তখন অনেক জাতীয়তাবাদী দেশনেতা বেলুড়মঠে এসে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরামর্শ চান। স্বামীজীর শরীর তখন অসুস্থ। তা সত্বেও তিনি তাদের উপদেশ দেন। নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি পাঠ করলে এ বিষয়ে কিছুটা জানা যাবে :—

'...সেবার শীতকালে কলকাতা লোকে লোকারণ্য। 'ভারতীয়

জাতীয় মহাসভা'র অধিবেশন হবে। দেশীয় অঞ্চল গুলিতে জনতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ আঁকাবাকা রাস্তায়, হিন্দু-বাড়ীর ভিতর-আঙিনায় সভা করে ছাত্রেরা একেক দলে হ'য়ে গলাবাজি করছে, নেতাদের আশেপাশে ভিড জমাচ্ছে। বড় বড় চৌমাথাগুলিতে দেশী পুলিশ ছড়ি হাতে ঘোড়সওয়ার হয়ে বহু কষ্টে পথচারীদের নিয়ন্ত্রিত করছে।

'বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে জাতীয় মহাসভাব সদস্যেরা এসেছেন। স্বামীজীব সঙ্গে দেখা করতে অনেকে বেলুড়ে আসতেন। সেইখানেই বহু বড় বড় নেতার সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ হল। তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীও ছিলেন। মহাসভার কর্মী হিসাবে নয়, সাধারণভাবেই সেবার অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি।

'স্বামীজীকে ভারতীয় নেতারা বলতেন 'দেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী'। তাঁর কাছে ঠিক কি যে তাঁরা চাইতে আসতেন, নিজেরাই বুঝতেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করে যখন ফিরে যেতেন, তখন সকলেই অল্প-বিস্তর বদলে যেতেন মনে-মনে। তাঁর উদ্দীপ্ত প্রেরণা সকলেরই চিত্ত জয় করত। এমন মানুষের দেখা পেলে সবার মনেই একটা অবিস্মরণীয় ছাপ পড়ে যায়।

'স্বামীজী দেখতেন, তাঁদের অস্ফুট জীবন অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। তিনি তাঁদের প্রণোদিত করতেন সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে। তাঁরা যেসব সমস্যার কথা তুলতেন, তা নিয়ে তিনি এমন ভাবে খোলাখুলি আলোচনা করতেন যাতে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন। কোনও পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও শ্রীরাম-কৃষ্ণ যেমন ছিলেন মূর্তিমন্ত বেদান্ত, জাতীয়-জীবন সম্বন্ধে তেমনি সহজাত জ্ঞান ছিল বিবেকানন্দের।

'একদিন তিলক বলছিলেন, তাঁর পিছনে আছে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা, আর সুরেন্দ্রনাথের পিছনে বাঙালীরা।

'কিন্তু জন-সাধারণের কোথায় স্থান?' স্বামীজী শুধন। 'ধর্মে

আঘাত না দিয়ে জনসাধারণের উন্নয়নই হ'ল সকল আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। জনশিক্ষায় তোমাদের টাকা খরচ কর।

'মানুষ তৈরী কর, মানুষ তৈরী করাই আমার কাজ'—এই একটি কথায় শ্রোতাদের মনে বহু সার্থক কল্পনার বীজ ছড়িয়ে দিতেন তিনি। যতদিন কলকাতায় ছিলেন, মহাসভার প্রতিনিধিরা বিকালটা এই সন্ন্যাসীর কাছেই কাটাতেন। এই বিশালবুদ্ধি মহাপুরুষকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে একটা ঘরোয়া জাতীয়-মহাসভার পত্তন হল যেন।...'

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নবভারতের উদ্‌গাতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধানতম মন্ত্রণাদাতা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পর স্বামী বিবেকানন্দকেই অরবিন্দ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এবং তাঁর বজ্রনির্ঘোষ বাণী থেকে লাভ করতেন ঘুমন্ত ও পরাধীন ভারতবর্ষকে জাগাবার অতুলনীয় কর্মপ্রেরণা।

অনেক বাঙালী অরবিন্দের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের কথা শুনে পাগল বলেছিল। এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের মত তেজস্বী পুরুষকেও অনেক রকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন: '...স্বামীজী বেলুড় মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শরীর ভাল নয়। চিকিৎসা চলিতেছে। স্বামীজীর সন্ন্যাসে অধিকার লইয়া নানাদিক হইতে নানারকম প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইহা আমাদের সামাজিক আবেষ্টনের একটি বিশেষ কুৎসিত পরিচয়। —তিনি পাশ্চাত্যদেশে কয়েক বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছেন, হিন্দুর অখাদ্য খাইয়াছেন, বিলাতী মেম তাঁহার শিষ্যা, গেরুয়া পরেন বটে কিন্তু ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। এরকমটা আগে কেহ দেখে নাই। গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসমান সমাজ নূতন কিছু দেখিলেই আঁতকে উঠে, নিন্দাও করে। গঙ্গাবক্ষে 'চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড়মঠ

দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা-তামাসা করিত এবং এমন কি সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজীর অমল-ধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না।' লোকনিন্দারূপ রাক্ষ-সীর হস্ত হইতে স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিরও নিস্তার নাই। অপরে কা কথা। এই সকল নিন্দা কানাঘুষা শুনিয়া স্বামীজী বলিতেন—'হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, যব নিন্দে সংসার।' কুত্তা? ঠিক মুখের মত জবাব। কিন্তু তবু কুত্তা ভুকে।'...

কিন্তু এ হেন বীরকেশরীর অকাল মৃত্যু ঘটলো। তাঁর পরলোক-গমনের কথা চিন্তা করে গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন অরবিন্দ। তিনি ভেবেছিলেন, বাংলায় এসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে অনেক প্রেরণা পাবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। তিনি নিরাশ হলেন। তিনি ভাবলেন, এবার বাংলাদেশ বীরশূন্য হলো, চলে গেল অন্ধকারের কোলে। এখন তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার মত কেউ নেই।

মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরে স্বামীজী প্রসঙ্গে লিখেছেন অরবিন্দ: 'বিরাট প্রাণপুরুষ বলে যদি কাউকেও স্বীকার করা যায় তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখেছি তাঁর প্রভাব আজও প্রবলভাবে কাজ করছে। সেই প্রভাব ভারতের আত্মাকে আলোড়িত করেছে। আমরা বলবো: বিবেকানন্দ এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর দেশজননীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।'...

বিবেকানন্দের প্রাণবিয়োগে কিছুকালের জন্যে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন অরবিন্দ। পরে নিজের শক্তিতে আবার বলীয়ান হলেন যখন ভাবলেন দেশজননীর অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে ভারত ছিল জীবন্ত মায়ের মত, দ্বিতীয় গর্ভধারিণী জননী।

কেবল মাটির মা নন। তাই সুদূর বরোদায় বসে তিনি শুনতে পেলেন বাংলা মায়ের কাতর ক্রন্দনধ্বনি। তিনি যে বাঙালী। বাঙালী জাতিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তার আছে ঐতিহ্য, অসাধারণ প্রাণশক্তি এবং অপূর্ব মেধা। এই তিনটি শক্তির বলে বাংলা ইচ্ছে করলে বিশ্ব জয় করতে পারে।

বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার লিখেছেন : 'বাঙালীর শক্তিতে শ্রীঅরবিন্দের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশের মাটিতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনার উপযোগী প্রচুর মালমসলা রহিয়াছে ; এবং বাঙালী জাতির মধ্য হইতেই গড়িয়া উঠিবে ভাবী কালের মুক্তি অভিযানের দুর্দ্ধর্ষ মৃত্যুঞ্জয়ী সেনা ও সেনানী। সেই জন্যই, তিনি বংলার উর্বর মাটিতে প্রথম বিপ্লবের বীজ রোপন করেন।'

সেইসময় বরোদার মহারাজার দেহরক্ষীর পদে ছিলেন একজন বাঙালী। তিনি সৈনিক থেকে পরে পদোন্নতি লাভ করে মহারাজার দেহরক্ষী হন। এটি সম্ভব হয়েছিল অরবিন্দের চেষ্টায়। এই যুবকের নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলায় আসল খানা জংশনের কাছে চান্না গ্রামে। ইনি যতীন্দর উপাধ্যায় এই ছদ্মনামে বরোদার সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। পরে ইনি অরবিন্দের নির্দেশে বাংলাদেশে আসেন এবং গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। পরে এঁর আর একটি নাম হলো নিরালম্ব স্বামী।

অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন 'ভবানী মন্দির' নামে গুটিকয়েক পুস্তিকা। তিনি বললেন, বাংলায় গিয়ে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবের বীজ রোপন করুন। আপনাকে এই কাজে সাহায্য করবেন সরলা দেবী আর প্রমথ মিত্র। তাঁদের কাছে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। আপনি বাংলায় গিয়ে তাঁদের কাছে আমার এই চিঠিটি দেখালেই কাজ হবে।

অরবিন্দের কাছ থেকে উৎসাহ ও আশীর্বাদ লাভ করে বিপ্লবী

যতীন্দ্রনাথ চলে এলেন বাংলায়। তিনি অরবিন্দের কথামত দেখা করলেন সরলা দেবী এবং প্রমথ মিত্রের সঙ্গে। তাঁদের হাতে তুলে দিলেন বিপ্লবী অরবিন্দের চিঠি।

সরলা দেবী যতীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন গুপ্ত সমিতি গড়ার কাজে। তাঁর সাহায্য পেয়ে যতীন্দ্রনাথ 'তরুণ সংঘ' নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন।

প্রমথ মিত্র কিন্তু এ কাজে যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করলেন না। তিনি বললেন, দেশের কাজের জন্য গুপ্ত সমিতিই বা স্থাপন করতে যাবো কেন? দরকার হলে প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করে দেশের যুবকদের সেখানে ব্যাপকভাবে ব্যায়ামচর্চার আয়োজন করবো।

পরে তাই করলেন প্রমথ মিত্র। 'অনুশীলন সমিতি' নাম দিয়ে একটি প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করে সেখানে যুবকদের শারীরিক শিক্ষা দিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে ঐ সমিতিতে চলতে লাগলো ছোরা খেলার আয়োজন। এই সমিতিটি স্থাপিত হলো কলকাতায় আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে।

পরে যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতিতে এসে সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। পরে তিনি মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুললেন একাধিক গুপ্ত সমিতি। সেগুলির নাম হচ্ছে 'যুব সংঘ' 'তরুণ সংঘ' এবং 'ভবানী মন্দির'। যতীন্দ্রনাথের এই কাজে সাহায্য করেন অরবিন্দের দুই মামা জ্ঞান বসু ও সত্যেন বসু।

যতীন্দ্রনাথের বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন: 'এই প্ল্যাঞ্চেটি ব্যাপারে ক্রমশঃ আমাদের জীবনের নদীপথে তরীখানি বাঁক নিয়ে আবার অন্য পথে চলবার আয়োজন করে নিলো। রামমোহন, কি বিবেকানন্দ বা অমনি কেউ এসে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করতে লাগল দেশে নব আনন্দমঠে সন্তান-সেনা গড়বার জন্যে। তখন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে, গুজরাটের গুপ্ত চক্রের

দেশপতি (প্রেসিডেন্ট) বরোদায়ই আছেন। তাঁর কাছে আদেশ পেয়ে বরোদা সেনা-বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় চলে গেছেন এবং সেখানে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলছেন। আমার ডাক পড়লো দেশের তরুণদের ও ছাত্রসমাজের মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করবার জন্যে। যতীনদা কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকার নাকি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় কর্তে পারেননি। আমাকে বাংলা দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে হাতী ধরে, গনগনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্যে গুপ্ত-মন্ত্রের দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠানো হল।'

বরোদায় বাস করলে কি হবে অরবিন্দের মন পড়ে রইলো বাংলার দিকে। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা করে যেতে লাগলেন। যতীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বেশ ভালভাবে প্রচার কার্য্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর অনুপ্রেরণা লাভ করে দেশের বহু আদর্শবাদী তরুণ জেগে উঠলো। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে এলো।

ওদিকে বারীন্দ্রকুমার ছিলেন বরোদায়। অরবিন্দ তাকে বললেন, তুমি বাংলায় ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করো।

বারীন্দ্র সেজদার কথামত বাংলায় এলেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে।

বাংলাদেশে এসে তিনি যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং গুপ্ত সমিতির কাজ করতে লাগলেন।

এরপর প্রমথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে দেশের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করলেন। অনুশীলন সমিতির উন্নতির জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগলেন।

একদিন বারীন্দ্রকুমার গেলেন 'হিতবাদী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক গণেশ দেউস্করের কাছে। তিনি তিলকের পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়ে যান।

দেউস্কর তাঁর সঙ্গে দু'চারটি কথা বলেই তৃপ্ত হলেন। পরে সেই তৃপ্তি গাঢ় হয়ে উঠলো বন্ধুত্বে। তিনি বারীন্দ্রের কাছে অরবিন্দের দেশোদ্ধারের কথা শুনে আনন্দ বোধ করলেন। সেই সঙ্গে মনে-প্রাণে সমর্থন জানালেন অরবিন্দের মতকে।

এরপর বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দকে পত্র মারফৎ জানালেন গণেশ দেউস্করের কথা। লিখলেন—সেজদা, হিতবাদীর সহ-সম্পাদক গণেশ দেউস্কর দেশোদ্ধারে তোমার মতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

বারীন্দ্রের চিঠি পেয়ে অরবিন্দ আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং সখারামকে লিখলেন, আপনি 'দেশের কথা' প্রসঙ্গে কিছু লিখুন।

অরবিন্দের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে সখারাম লিখতে আরম্ভ করলেন 'দেশের কথা' নামক একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি লেখার সময় বারীন্দ্রকুমার এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য্য অনেক মালমসলা দিয়ে সাহায্য করেন।

এই গ্রন্থে বৃটিশ শাসনেব আদিপর্ব হতে তদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত এক নাতিদীর্ঘ ইতিহাস লেখা হলো। সেই সঙ্গে ওতে আব একটি বিষয়ও স্থান পেল। বিষয়টি হচ্ছে ইংরাজ বণিকদের হাতে দেশেব বণিকরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। তাদের মনে সাহস দেবার জন্যে তাদের প্রসঙ্গ উঠলো 'দেশের-কথা'য়।

এর ফলও পাওয়া গেল। দেশীয় ব্যবসায়ীরা দেশীয় শিল্প প্রসাবের উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগলো।

সখারাম বেশ ভাল বাংলা জানতেন। তিনি বাংলাদেশে মারাঠাদের বীরপূজা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি শিবাজীর একখানি জীবনচরিত লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

বাংলাদেশে শিবাজী উৎসব প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'-এ লিখেছেন ঃ 'বোম্বাই প্রদেশে মারাঠা জাতির মধ্যে শ্রীযুক্ত তিলক যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

তিলক প্রবর্ত্তিত 'শিবাজী-উৎসবের' তরঙ্গ বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সম্ভবতঃ ১৯০২ সালে মারাঠার এই বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় ও মফঃস্বলে 'শিবাজী উৎসবে'র সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব' সম্বন্ধে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়াছে।...দুঃখের বিষয় তাঁহার এই বিখ্যাত কবিতাটি কাব্য-গ্রন্থে নাই।'

বিপ্লবী মতিলাল রায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শতবর্ষের বাংলা'-এ লিখেছেন: 'সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সম্ভবতঃ ১৯০২ সালে মারাঠার বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া মারাঠী ও বাঙ্গালীর মধ্যে এক জাতীয়তাসূত্রের সখ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় 'শিবাজী উৎসবে'র সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবিবাবুর সুবিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী' এই উৎসব উপলক্ষে বিরচিত হয়—জাতীয়তার মনীষী বিপিনচন্দ্রও সেদিন সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।'

দেখতে দেখতে বাংলার আকাশ বাতাস স্বদেশ মুক্তির আন্দোলনে মুখরিত হয়ে উঠলো। যুবকদের মুখে বন্দে মাতরম মন্ত্র উচ্চারিত হলো। বারীন্দ্র ত্যাগী পরিব্রাজকের ব্রত নিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন কয়েকটি গুপ্ত সমিতি।

অবশ্য সকলেই যে তাঁর ডাকে সাড়া দিলো এমন কথা বলতে পারি না। কিছু সংখ্যক যুবক সাড়া দিলো। তারা 'ভবানী মন্দির' এবং আনন্দমঠের আদর্শে এবং মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজীর অনুপ্রেরণায় দেশের মুক্তি সংগ্রামের কাজে এগিয়ে এলো। তাদের চোখে-মুখে বলিষ্ঠ ভাব। তারা যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত।

তাদের দেখে খুশী হলেন বারীন্দ্রকুমার। মনে মনে ভাবলেন,

যাক, আমার ব্রত তাহলে অনেকটা সিদ্ধ হয়েছে। কিছু সংখ্যক যুবককে তো কাছে পেয়েছি। ব্যস্, কেল্লা ফতে। এদের দিয়েই আমি অনেক কাজ করতে পারবো। কাজ অল্প মানুষ দিয়েই হয়। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে বারীনের মনে পড়ে গেল স্বামী বিবেকানন্দের কথা। স্বামীজী একা অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারতো আমি কি করে গেলুম।

এছাড়া স্বামীজী বাছাই করা কয়েকটি যুবক চেয়েছিলেন যারা ভারতের কল্যাণের জন্যে কাজ করতে পারবে।

কিন্তু তাঁর সেদিনকার সেই মহান ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল। জীবদ্দশায় তিনি মনোমত যুবকবৃন্দ পাননি বটে কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলো তাঁর স্বপ্নের ভারত। এলো অগণিত শক্তিমান যুবক যারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদেব আহুতি দিলো। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অরবিন্দ।

বারীন্দ্রকুমার ভাবলেন, স্বামীজীর স্বপ্ন এবার সত্য হতে চলেছে। তিনি একসময়ে চেয়ে ভাল ছেলে সংগ্রহ করতে পারেননি কিন্তু এবার বারীন্দ্র সেই অসাধ্যসাধন করেছেন।

প্রথম প্রথম গুপ্ত সমিতি বিশেষ কাজ দেখাতে না পারলেও অনুশীলন সমিতি পুরোদমে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। বাংলার অনেক জায়গায় প্রমথ মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হলো। এর সঙ্গে সরলা দেবীও যোগ দিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'-এ লিখেছেন: 'শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে একথা বাঙ্গালী ও মারাঠীর মধ্যে প্রথম জাগিয়াছিল। বাংলাদেশে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও স্বর্গীয় ব্যারিস্টার পি, মিত্র প্রভৃতি

কতিপয় উৎসাহী হৃদয় কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে যুবকদের লইয়া একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছেলেদের নৈতিক, মানসিক, দৈহিক উন্নতি-সাধন ইহাই পরযুগে অনুশীলন সমিতির সূচনা। 'অনুশীলন' কথাটি বঙ্কিমবাবুর নিকট হইতে গৃহীত। প্রথম ইহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। সেখানে আত্মরক্ষার নানাবিধ কৌশল ও লাঠি খেলার চেষ্টা চলিত। তখনকার শরীর চর্চ্চা কিন্তু সাধারণ রাস্তা-ঘাটে, রেল-ষ্টীমারে গোরার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই চলিয়াছিল। লাঠি খেলা ও আখ্ড়ার সঙ্গে ঐ সময়ে গুপ্ত-সমিতির কল্পনা ও তাহা গড়া চলিতেছিল। তবে তাহাদের কোন বিশেষ কার্য্যকলাপ তখনও দেশে প্রত্যক্ষ হয় নাই। পৃথক ও বিক্ষিপ্তভাবে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের আকাঙ্খা, দেশকে স্বাধীন করিবার বাসনা, অনেকের মনেই দেখা দিয়াছিল এবং তাহা লাভের উপায় সম্বন্ধেও বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ও স্বদেশী যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশে এই শ্রেণীর বিপ্লববাদ প্রচারিত হইতেছিল—যথার্থ বিপ্লবকর্মের বিষ দেশ-মধ্যে তখনও প্রবেশ লাভ করে নাই।'

গুপ্ত সমিতির কাজে হঠাৎ গতিশীলতা ব্যাহত হলো। তার কারণও আছে। বারীন্দ্রের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মতের মিল হলো না। শেষকালে যতীন্দ্রনাথ বারীন্দ্রের হাতে গুপ্ত সমিতির সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করলেন। তাঁর নতুন নাম হলো নিরালম্ব স্বামী।

গুপ্ত সমিতি হতে যতীন্দ্রনাথের বিদায় গ্রহণে বাংলাদেশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন স্তিমিত হলেও একেবারে থেমে থাকেনি। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম দিয়ে অনুরূপ অন্যান্য সমিতি গড়ে উঠলো। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো 'অনুশীলন সমিতি' বরিশালে প্রতিষ্ঠিত হলো 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'। ফরিদপুরে 'ব্রতী সমিতি' মৈমনসিংহে 'সাধনা সমিতি' ও 'সুহৃদ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হলো।

ঢাকার অনুশীলন সমিতি পরে একটি বিরাট ব্যায়ামাগারে রূপ নিলো।

ঢাকা ও ফরিদপুরের সমিতি দু'টি পরিচালিত হতে লাগলো মনিষী অশ্বিনীকুমার দত্তের পরিচালনায়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই সকল সমিতিতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষ স্থান পায়নি। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সেবা করা। তাহলেও এই সমিতিগুলির কর্মীদের মনে সুপ্ত ছিল একনিষ্ঠ দেশপ্রেম। তারা মনে মনে জানতো দেশের মানুষদের উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। তারা ভালভাবে মানুষ হলে দেশের মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হবে এবং তারা দেশের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে নিতে সমর্থ হবে।

এই সময় কলকাতায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী একটি আধা-বিপ্লবী দল গঠন করেন। সেই সঙ্গে তিনি মুসলমান যুবকদের মনে দেশপ্রেমের ভাব জাগিয়ে তোলেন। এতকাল পর্যন্ত মুসলমানগণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেননি। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। কারণ তাদের মধ্যে তখনো তেমন শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। তারা প্রথমদিকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যকে বয়কট করেছিল। এই কারণে তাদের মনে মুক্তিসংগ্রামের চেতনা ঠাঁই পায়নি। এবার সেই অসাধ্য সাধনের কাজ আরম্ভ করলেন অনুশীলন এবং গুপ্ত সমিতির যুবকগণ। তাঁরা মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

বাংলার যুবশক্তির মধ্যে অভূতপুর্ব জাগরণ লক্ষ্য করে ইংরাজ শাসকগণ ভীত হলেন। তাঁরা বিপ্লবী যুবকদের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে লাগলেন। তাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগালো।

বুদ্ধিমান যুবকরাও ইংরাজ শাসকদের চাতুরী বুঝতে পারলেন।

তাঁরা সমিতির কার্য্যালয়ে সংগৃহীত বন্দুক ও রিভলভার অন্যত্র সরিয়ে ফেললেন। এই সময় তাঁরা সমিতির কাজে ঢিলে দিয়ে নিজেদের ঘরের কাজে অধিকতর ভাবে মনোনিবেশ করেন। বিপ্লবী বারীন্দ্র চলে গেলেন বরোদায়।

এ সময় লর্ড কার্জন এলেন ভারতের বড়লাট হয়ে। তিনি এদেশীয় যুবকদের মনে জাতীয়তার ব্যাপক উন্মেষ লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেলেন। ভাবলেন, তাদের মনে ঐ ভাব বাড়তে দিলে ইংরাজদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে থাকা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে। এমন কি পরিণামে রাজত্বও চলে যেতে পারে। তাই একে আর বাড়তে না দিয়ে অঙ্কুরে বিনাশ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কি ভাবে এই আন্দোলন পর্য্যুদস্ত করা যায়? কোথায় এর জন্ম?

অনেক অনুসন্ধান করে কার্জন জানতে পারলেন, বাঙালীর জীবনে জাতীয়তাবোধের এই জাগরণ এনে দিয়েছে তার জাতীয় সাহিত্য। তাই বাঙালী যাতে উচ্চশিক্ষার পথে এগুতে না পাবে সেই উদ্দেশ্যে, ১৯০৭ সালে একটি আইন বিধিবদ্ধ হলো। তার নাম 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস অ্যাক্ট'।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন স্যার আশুতোষ। তাঁর অপূর্ব বিদ্যাবত্তা ও তেজস্বিতা গুণের জন্যে তিনি বাংলার মানুষদের কাছে বাংলার বাঘ নামে পরিচিত ছিলেন। এ হেন তেজস্বী পুরুষ বৃটিশ শাসকদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করতে পেছ্-পা হতেন না। স্যার আশুতোষ লর্ড কার্জন প্রবর্ত্তিত 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস্ অ্যাক্ট'এর সমালোচনা করলেন। পরে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গালীর শিক্ষার পথ রুদ্ধ হলো না।

কিন্তু তবু দুষ্টমতি কার্জন শান্ত হলেন না। তিনি দেখলেন, ভারতে যে স্বাধীনতা আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তার প্রাণ-স্বরূপ হচ্ছে বাঙ্গালী জাতির উচ্চশিক্ষা এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তাই এই বাঙ্গালী জাতির মর্মে আঘাত হানবার জন্যে তিনি চেষ্টা করলেন

বাংলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে। এই পৃথকত্বের মাধ্যমে বাঙালী জাতির মধ্যে যে ভাঙন দেখা দেবে তার ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। তখন ইংরাজদের পক্ষে সুবিধে হবে নিরাপদে ভারতবর্ষের বুকের ওপর বসে সাম্রাজ্য শাসন করা।

অরবিন্দ বরোদায় বসে ইংরাজ বড়লাটের চালাকি ও বুদ্ধির দৌড় লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এর জন্যে আদৌ নিরাশ হলেন না। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন, আগামী দিনে বাঙালী এমন এক শক্তি নিয়ে জাগছে যে তার সামনে দাঁড়ানো বৃটিশ শাসকদের পক্ষে হবে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। অরবিন্দ সেদিন এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন আধ্যাত্মিক অনুভূতির বলে। কেবল তখন বা কেন তিনি যখন ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করতেন সেই সময় তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যুগসত্য এবং সেখানে তাঁর ভূমিকা। তখন তাঁর বয়েস মাত্র এগারো বছর। এ তাঁর পূর্বজন্মার্জিত সাধন ভজনের ফল। তাই এই জন্মে তিনি যোগী হতে পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী নগেন্দ্র কুমার লিখেছেন: 'ইংলণ্ডে বিদ্যাভ্যাস কালে এগারো বৎসর বয়সেই তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, উত্তরকালে পৃথিবীতে একটা ব্যাপক অভ্যুত্থান ও বৈপ্লাবক পরিবর্ত্তনের যুগ আসিবে এবং উহাতে তাঁহার অংশ গ্রহণ করা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং স্বদেশের দাসত্ব-মুক্তির আকাঙ্খায় ওই ধারণা নিয়ন্ত্রিত হইল।'...

অরবিন্দ ছিলেন আশাবাদী। তিনি ভাবলেন, ইংরাজ শাসক যত চেষ্টাই করুন না কেন বাংলায় বিপ্লবের যে বীজ রোপিত হয়েছে তা অদূর ভবিষ্যতে ফলে-ফুলে বিকসিত হবে। সেই সুদিনের অপেক্ষায় তিনি কাল গুণতে লাগলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ। বরোদায় নিভৃতস্থানে ধ্যানমগ্ন আছেন অরবিন্দ এই ধ্যানের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন ভবিষ্যৎ ভারতের

রূপ।* হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে। তারা একত্রে সমবেত কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করেছে বন্দে মাতরম। তারা এখন ভারতীয়। তারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ইংরাজ রাজশক্তির শত রকম দুরভিসন্ধি তাদের এই মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হতে বাধ্য।

দুরভিসন্ধিপরায়ণ ইংরাজ শাসক ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে দমাবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ আনতে চাইলো। এই জাতিভেদকে কেন্দ্র করে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব জানিয়ে বৃটিশ বড়লাট লর্ড কার্জন বিলেতের মন্ত্রীসভার কাছে একটি খসড়া বিল পেশ করলো। এই বিলের সমর্থনে লর্ড কার্জন এক স্পেশাল ডেচপ্যাচ মারফৎ মন্ত্রীসভাকে জানিয়ে দিলেন যে ভারতে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে স্থায়ীত্ব দিতে হয় তাহলে অবিলম্বে বঙ্গভঙ্গ করা হোক।

অরবিন্দ বরোদায় অবস্থান করে এইসবল ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। তিনি ইংরাজদের এই কাজ লক্ষ্য করে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে অরবিন্দ যোগদান করেন এবং কংগ্রেস সভ্যদের জানিয়ে দেন ইংরাজ সরকারের দুষ্ট বুদ্ধির কথা। বিশেষ করে তিনি সাক্ষাৎ করলেন মহারাষ্ট্রনেতা বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে। তিনি তিলককে বুঝিয়ে বললেন, এখুনি কংগ্রেসকে এমন এক নতুন নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে করে এদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে।

কিন্তু তখন কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব মানতে রাজী হলো না। কংগ্রেসের মডারেটপন্থীরা তখন আবেদন-নিবেদন করা ছাড়া আর কোন কাজে মন দিলো না।

তাই দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না অরবিন্দ। তিনি বারীন্দ্রকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন।

বারীন্দ্র এলেন বাংলাদেশে অরবিন্দের দূত হয়ে। তিনি বাংলার শিক্ষিত মানুষদের ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন ইংরাজদের অপকৌশলের কথা। সেই সঙ্গে বললেন অরবিন্দের ভাবী কর্মের আদর্শ। অরবিন্দ চান বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আজকের প্রতিটি বাঙালীর উচিত কাজ হবে এগিয়ে আসা।

এভাবে বারীন্দ্র সমগ্র বাঙালী জাতিকে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত থাকতে বললেন। তিনি জানালেন, যদি বঙ্গভঙ্গ বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করতে হবে। বাঙালী হচ্ছে ভাবী নতুন ভারতের অগ্রদূত। ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে বাঙালীর কর্মে। আজ যদি বাঙালী ইংরাজদের কুচক্র-জাল ভেদ করতে সক্ষম হয় তাহলে ভারতের মুক্তি আসতে আর বেশী দেরী হবে না।

এরপর বারীন্দ্র তাঁর মেসোমশাই 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে অরবিন্দের কথা জানান। সেই সঙ্গে এও বলেন, আপনি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করুন। বঙ্গভঙ্গ বিল যদি বিলেতের পার্লামেন্টে গৃহীত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। আর তা যদি না করা হয় তাহলে দেশের সর্বনাশ আসতে বাধ্য। সুতরাং এখন হতে সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

এই প্রকার পরামর্শ দিয়ে বারীন্দ্র আবার ফিরে গেলেন বরোদায়।

দেখা করলেন অরবিন্দের সঙ্গে। তাঁকে বাংলাদেশের অবস্থা বুঝিয়ে বললেন।

পরে অরবিন্দ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা no compromise

ইস্তাহার লিখে ছাপালেন এবং বারীন্দ্রের হাতে সেই ইস্তাহার আর 'ভবানীমন্দির' নামক পুস্তিকা তুলে দিয়ে বললেন, তুমি এগুলি নিয়ে আবার বাংলাদেশে চলে যাও। সেখানে গিয়ে এগুলি প্রচার করতে থাকো জনসাধারণের মধ্যে।

তিনি এও বললেন, আপাতত ভবানীমন্দির ও বন্দে মাতরম মন্ত্র প্রচার করবে। তারপর যখন বঙ্গভঙ্গ স্থির হবে তখন no compromise ইস্তাহার দেশময় ছড়িয়ে দেবে। মোট কথা তুমি এসব কাজ চালাবে বন্দে মাতরম মন্ত্রে বিশ্বাস রেখে। তাহলেই দেখবে তোমার কাজ সফল হয়ে উঠবে।

দাদার কথা শিরোধার্য্য করলেন বারীন্দ্রকুমার। তাঁর উপদেশ এর আশীর্বাদ নিয়ে বাংলাদেশ অভিমুখে রওনা হলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ, মার্চ মাস। বারীন্দ্র কলকাতায় এসে আগেকার গুপ্ত সমিতির সভ্যদের খুঁজে বের করলেন এবং তাদের দ্বারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। এগুলি গঠিত হলো ভবানীমন্দিরের আদর্শে।

এরপর ইংরাজ শাসক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন যে তাঁরা বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সায় দেবেন তখন বারীন্দ্র গোপনে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী no compromise নামে ইস্তাহার প্রচার করতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে আশানুরূপ ফল পেলেন না। ভাবলেন, এই সঙ্কট মুহূর্তে বাংলাদেশে যতখানি ব্যাপকভাবে আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততখানি হচ্ছে না। তিনি বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরে সমস্ত ব্যাপারটি অরবিন্দকে জানালেন।

অরবিন্দও স্থির থাকতে পারলেন না বরোদায়। তাঁর দেহ ছিল বরোদায় কিন্তু মন পড়ে ছিলো বাংলাদেশে।

বারীন্দ্রের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্র ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে বাংলায় এলেন। এখানে এসেই তিনি

মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রকে নিয়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বহু সভাসমিতি করে জনসাধারণকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, আমাদের এখন একতাবদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নামতে হবে। আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর মন্ত্র বন্দে মাতরম। ঐ মন্ত্রই আমাদের আত্মার বাণী—সংগ্রামে বিপুল শক্তি। এই বাণী কণ্ঠে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হবো। ইংরাজদের সমস্ত অপকৌশল নাশ হবে।

তিনি আরও বললেন, যদি ইংরাজ শাসক জনগণের দাবী অগ্রাহ্য করে বঙ্গবিভাগ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অসহযোগ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, সরকারী বিদ্যালয় সমূহ বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরাজ সরকার বঙ্গব্যবচ্ছেদের সম্মতি জানালেন।

তার বিরুদ্ধে চারদিকে প্রবল আন্দোলন দেখা দিলো। বিভিন্ন কাগজে তার বিপক্ষে কড়া মন্তব্য প্রকাশিত হলো।

'সঞ্জীবণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। তিনিও লিখলেন জোরালো মন্তব্য।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দৈনিক 'বেঙ্গলী' কাগজের সম্পাদক। তিনিও বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন।

'বেঙ্গলী' কাগজের অফিস থেকে তখন আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তার নাম 'হিতবাদী', পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। তার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ আর সহ-সম্পাদক ছিলেন সখারাম গণেশ দেউসকর। এঁরা দু'জনেই অরবিন্দের মত সমর্থন করে পত্রিকায় জোরালো ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র একদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে বললেন, আপনাকে দেশের এই সঙ্কটকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব নিতে হবে।

বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ রাজী হয়ে গেলেন।

এবার থেকে কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, সখারাম গণেশ দেউসকর প্রভৃতি সকলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করলেন এবং স্থির হলো তাঁরা বিপ্লবী অরবিন্দের মতের অনুগামী হয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন।

মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ। এখানকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ সেন হচ্ছেন দেশপূজ্য অশ্বিনী-কুমার দত্তের সুযোগ্য ছাত্র।

১৮০৫ সালের জুলাই মাসে ঐ বিদ্যালয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করে বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব ওঠে। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, অরবিন্দ এবং বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ও সুসাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ এই বিদ্যালয়টি জাতীয় বিদ্যা-লয়ে রূপান্তরিত করা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটি সভায় পাশ হয়ে গেল। কেবল তাই নয় প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ সেন অরবিন্দের আদর্শ ও মত গ্রহণ করে নিজেকে বাংলার জাতীয়তাবাদী নাগরিক বলে পরিচয় দিলেন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

ঐ সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ অরবিন্দ একটি প্রস্তাব রচনা করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন তা সমর্থন করলেন।

ঐ প্রস্তাবের মূল বয়ান ছিল বিলাতী দ্রব্য বর্জন।

এতদিন পর্যন্ত এই কথাটি মুখে মুখে আলোচিত হতো কিংবা গোপনে গুপ্ত সমিতির সভ্যরা আলোচনা করতেন। এবার তা প্রকাশ্যে এবং কাগজে কলমে রূপ নিয়ে জনসাধারণের সামনে এসে উপস্থিত হলো। বাংলার নবজাগ্রত জনসাধারণ তা মনে প্রাণে গ্রহণ করলো।

অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের মাঝে উদাত্ত কণ্ঠে'প্রচার করলেন, বিদেশী ইংরাজ ব্যবসায়ী জাতি। তারা স্বদেশ ইংলণ্ড থেকে তাদের জিনিষ এদেশে নিয়ে এসে অধিক দামে আমাদের কাছে বিক্রী করছে। এর দ্বারা আমাদের কাছ থেকে অধিক অর্থ ছিনিয়ে নিচ্ছে তারা অধিক মুনাফা নিয়ে স্বদেশে চলে যাচ্ছে। এভাবে আমাদের দেশীয় অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে—উল্টে আমাদের দেশে কোন সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। আমরা অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে পারছি না দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশা এসে আমাদের গ্রাস করছে। সুতরাং এখন আমাদের জাগতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে বিদেশী জিনিষ বর্জন করে স্বদেশী জিনিষ উৎপাদন করতে হবে। তবেই আমাদের সুখ হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। এর জন্যে চাই সবার আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তারপর আসবে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা।

জনগণ অরবিন্দের বক্তৃতাকে স্বাগত জানালো। অরবিন্দ বললেন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন করলে বিলাতের মানুষরা মহা অসুবিধায় পড়বে। এভাবে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে তারা এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশ অভিমুখে পাড়ি দেবে। তখন স্বাধীনতা আমাদের কাছে সহজলভ্য বস্তু হয়ে উঠবে।

অরবিন্দের এই প্রকার যুক্তিসম্মত বাক্য জনগণ মেনে নিলো তারা একসঙ্গে বলে উঠলো, সাধু! সাধু!! সাধু প্রস্তাব। এখুনি একে গ্রহণ করা হোক।

কিশোরগঞ্জ হতে ফিরে এলেন অরবিন্দ কলকাতায়। এখানে এক মহতী জনসভার আয়োজন করে দেশবাসীর কাছে জানাবেন তার প্রস্তাব।

স্থির হলো কলকাতার টাউন হলে জনসভা বসবে। এর জন্যে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

সভা বসলো ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে। এই সভায়

সভাপতি নির্বাচিত হলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। এছাড়া যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঐ সভায় নিমন্ত্রণ জানানো হলো তাঁরা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা ব্রজেন্দ্র-কিশোর চৌধুরী, মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউসকর, সুন্দরীমোহন দাস, ব্যারিষ্টার জে. চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, গিষপতি কাব্যতীর্থ, এ. রসুল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেশ সমাজপতি

সকাল থেকে আরম্ভ করে দলে দলে জনসাধারণ আসতে লাগলো টাউন হলের দিকে সকলের মুখে এক ধ্বনি—'বন্দে মাতরম'।

দেখতে দেখতে সারা হলটি জনতায় পূর্ণ হয়ে গেল। সেখানে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

এবার সভা আরম্ভ হলো বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দিলেন ইংরাজ শাসকের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে।

শেষকালে মহালগ্ন উপস্থিত হলো প্রস্তাব গ্রহণের।

অরবিন্দ যে প্রস্তাবটি রচনা করেছিলেন তা উত্থাপন করলেন তাঁর মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র। অরবিন্দ নিজে তা উত্থাপন করলেন না। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি যে সমস্ত রাজনৈতিক কাজ করে এসেছেন তা সম্পূর্ণ নেপথ্যে সংঘটিত হয়েছে। তিনি চিরকালই ছিলেন নীরব কর্মী। তাঁর স্বল্পকালের রাজনৈতিক জীবনও কেটেছে নেপথ্যে। অন্তরালে থেকে তিনি দেশের তরুণ সমাজকে যেভাবে পরিচালিত করেছেন তার তুলনা মেলা ভার।

কৃষ্ণকুমার অরবিন্দের প্রস্তাবটি পেশ করলেন সভায়। এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে : 'ইংরেজের শাসন এবং শোষণের

ফলে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের যে শোচনীয় অবস্থা 'আজ হয়েছে এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় সংঘবদ্ধ ভাবে সর্বপ্রকার বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং এই উপায়েই ইংরাজের ভবিষ্যৎ শোষণের পথ রুদ্ধ হবে। ইংরেজের ন্যায় বিচারে আমাদের আর বিশ্বাস নেই, আমরা তাই তাদের আইন-আদালত বর্জন করে ইংরেজের শাসনকে অসম্ভব করে তুলবো। ইংরেজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের আস্থা নেই, আমরা তাই ইংরেজের স্কুলে আমাদের ছেলেদের আর পাঠাব না।'

অরবিন্দের প্রস্তাব শুনে সকলে আনন্দ প্রকাশ করলো। পরে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো।

সভায় সমবেত জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, ইংরাজ যদি আবেদন-নিবেদনে সাড়া না দেয় তাহলে এই প্রস্তাব মত কাজ শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। .

সভা শেষ হবার আগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতার পদে বরণ করা হয় যাতে তিনি আগামী দিনে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঠিকঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

তিনিও সম্মতি জানালেন এবং নিজের হাতে এর গুরু দায়িত্বভার তুলে নেন।

ক্রমে কলকাতায় টাউন হলে গৃহীত এই প্রস্তাবের কথা সমগ্র বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। দেশের শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলের কানে গিয়ে পৌঁছলো এই মহান ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা। সেদিন শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের টনক নড়লো। তাঁরা বুঝতে পারলেন ভারতের বুকে বিদেশী ইংরাজকে রাজত্ব চালাতে দেওয়া উচিত কাজ হবে না। যেমন করে হোক তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

অরবিন্দ গণজাগরণ দেখে খুশি হলেন। তিনি ফিরে গেলেন বরোদায়।

ওদিকে খবর এলো বিলেতের পার্লামেণ্টে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের খসড়া অনুমোদিত হয়ে সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেছে।

এই সংবাদ শোনার পর দেশের মানুষ বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে নেমে পড়লো। তারা এক জায়গায় বিলাতী পোষাক-পরিচ্ছদ একত্র করে আগুন ধরিয়ে দিলো।

কলকাতা ও বাংলা দেশের সর্বত্র আন্দোলনের সাড়া পড়ে গেল।

লর্ড কার্জন দেখলেন, এই আন্দোলনকে দমাতে তাড়াতাড়ি ঘোষণা করলেন বাংলা দ্বিখণ্ডিত করার দিন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর এই দিনটি ঘোষিত হলো।

এর ফলে দেশের জনগণ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের কাছে নেতারা এসে বললেন, ঐ দিনটি আমরা শোকদিবস রূপে পালন করবো।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর। লর্ড কার্জন এই দিনটিকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্য্যকরী করার দিন বলে ঘোষণা করলেন।

ঐ দিন সকালে দেশের নেতৃবর্গ থেকে আরম্ভ করে জনসাধারণ সকলে এলো গঙ্গার তীরে। সকলের মুখে ধ্বনিত হতে লাগলো 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সকলে জাহ্নবীর পবিত্র জলে অবগাহন করলো।

গঙ্গা থেকে উঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে রাখী পরিয়ে দিয়ে গান ধরলো :

'ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই, ভেদ নাই।'

এই গানটি রচনা করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনিও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং রাখি বন্ধনের কাজে রত হলেন।

তারপর সকলে নগ্ন পায়ে রাজপথ পরিক্রমা শুরু করে দিলেন।

সেই সঙ্গে তাঁরা জনসাধারণকে বললেন, তোমরা বিলাতী জিনিষ বর্জন করো।

ঐ শোকযাত্রায় সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি হতে আরম্ভ করে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যোগদান করলেন। তাঁরা হলেন মহারাজা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা পিয়ারী-মোহন মুখোপাধ্যায়, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এবং মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী

এ গেল সকালের অনুষ্ঠান বিকেলেও বীডন স্কোয়ার ও কলেজ স্কোয়ারে সভার আয়োজন করা হলো।

এরপর সকলে এলেন পার্শিবাগানের মাঠে। সেখানে সকলে একত্রিত হয়ে একটি সভা করলেন .তারপর স্থাপন করা হলো ফেডারেশন হলের ভিত্তি।

ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আনন্দ মোহন বসু।

তিনি সেই সময় অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন তাই তাঁকে চেয়ারে করে সভায় আনা হলো। স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর নাম প্রস্তাব করলেন সভাপতি হিসাবে

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তা সমর্থন জানান। এরপর সভাপতির অনুরোধক্রমে সুরেন্দ্রনাথ সভায় সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা অনুবাদ করে জনসাধারণকে শোনালেন।

সমবেত জনগণ প্রস্তাবিত মিলন মন্দিরের জন্য চাঁদা দিলেন। বৃটিশ শাসক এবার হাড়ে হাড়ে টের পেলেন তাঁরা কাগজে-কলমে বাংলা ভাগ করলে কি হবে বাঙালী মনে-প্রাণে এক ও অখণ্ড আছে ও থাকবে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে কোন রকম ভেদ নেই।

আন্দোলন খুব জোরদার চলতে লাগলো। প্রতিদিন পার্কে পার্কে সভার আয়োজন এবং পথে মিছিল বেরুতে লাগলো।

এই সময় কোন সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র ছদ্ম নামে অরবিন্দের লেখা ছাপতে রাজী হলো না। সুতরাং অরবিন্দ প্রকাশ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে পারলেন না।

একদিকে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করার আন্দোলন চলতে লাগলো, অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মডারেট পন্থীরা ইংরাজদের সঙ্গে আবেদন নিবেদনের দ্বারা বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব উঠিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু চতুর ইংরাজ তাঁদের কথায় সায় দিলেন না।

সেই সময় ভারত সচিব ছিলেন লর্ড মর্লি। তিনি বললেন, এ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়—settled fact unsettled হবে কি করে?

ইংরাজ লাট সাহেবের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তার খবর গিয়ে পৌঁছলো বরোদায় অরবিন্দ শুনে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ করলেন না। বরং আন্দোলন যাতে আরও জোরদার হয় তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করলেন, একটি কাগজ বের করবেন। তার নাম দেবেন 'যুগান্তর'। এটি হবে তাঁর দলের মুখপত্র। এতে লেখা হবে আপোষহীন সংগ্রামের কথা।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজও এগিয়ে গেল। তিনি বাংলাদেশে বারীন্দ্রকুমারকে পত্র মারফৎ জানালেন, তুমি একটা পত্রিকা প্রকাশ করো এবং তার নাম দাও 'যুগান্তর'। টাকার জন্য ভেবো না। আমি টাকা পাঠাচ্ছি।

দাদার কথামত বারীন্দ্র 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করার জন্যে আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর সহকর্মী অবিনাশ ভট্টাচার্য্য তখন অবস্থান করছিলেন কটকে।

বারীন্দ্র তাঁকে চিঠি লিখলেন, তুমি তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে এসো। বিশেষ কাজ আছে।

বারীন্দ্রের পত্র পেয়ে অবিনাশ বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কলকাতায়।

এদিকে বারীন্দ্রকুমার ২৭নং কানাই লাল ধর লেনে একটা বাড়ী ভাড়া করে সেখান থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করার আয়োজন করতে লাগলেন।

ঐ সময় বাংলাদেশে আর একটি সংবাদ পত্র আত্মপ্রকাশ করে। তার নাম 'সন্ধ্যা'। এটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। এর উদ্যোক্তা হলেন সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ, ডিসেম্বর মাস। বারাণসী শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। সভাপতি হলেন মহামতি গোখেল.

গোখেল ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক শিষ্য এবং 'দি সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা।

অরবিন্দ ভাবলেন, এই তো মহা সুযোগ। এখন তিলকের মারফৎ অনায়াসে তিনি কংগ্রেসের উঁচু বেদী হতে তাঁর চারদফা বয়কট সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ নাগপুরের ডাক্তার মুঞ্জে. খাপর্দে, যুক্ত প্রদেশের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় প্রভৃতিকে ব্যক্তিগত ভাবে পত্র মারফৎ তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। তাতে তিনি লিখলেন, বাংলার সমস্যাকে যেন সর্বভারতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়।

বারাণসী কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গণ্যমান্য অতিথি আসতে লাগলেন তাঁরা হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, অরবিন্দ এবং লাজপত রায়।

তিলক ভরসা দিলেন অরবিন্দকে, তোমার প্রস্তাব নিশ্চয়ই গৃহীত হবে।

কিন্তু ফল হলো ভিন্ন।

প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন বাংলা সম্বন্ধে কথা উঠলো তখন লালা লাজপত রায় বললেনঃ 'বাংলার দুর্ভাগ্যের বিষয় আপনারা সব শুনেছেন। ভারতে এক নতুন রাজনৈতিক যুগ প্রবর্তন করবার জন্যে ভগবান বাঙালীকে আজ যে স্বর্ণ সুযোগ দিয়েছেন এর জন্য তাঁদেরকে অভিনন্দিত করছি। আমার মনে হয় বাংলার জন্যেই এই গৌরব নির্দিষ্ট ছিল। কারণ ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ বাঙ্গালীই প্রথম লাভ করে।'

অরবিন্দের প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্যে অনেকরকম চেষ্টা চললো; কিন্তু তা গৃহীত হলো না।

যে প্রস্তাবটি ঐ অধিবেশনে গৃহীত হলো তা নিম্নরূপঃ—

'That this Congress records its earnest and emphatic protest against the repressive measures which have been adopted by the authorities in Bengal after the people there had been compelled to resort to the boycott of foreign goods as a last protest and perhaps the only constitutional and effective means left to them of drawing the attention of the authorities persisting in their determination to partition Bengal in utter disregard of the universal prayers and protests of the people'.

এর চাইতে আর বেশী কিছু করতে পারেনি তখনকার দিনে কংগ্রেস। অরবিন্দ খুব খুশী হলেন না। তিনি তিলকের কাছে গোখেল ও তার অনুগামীদের প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন। 'They are the serpents of the India society.'

এই বারাণসী কংগ্রেস অরবিন্দের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার প্রস্তাবে সায় না দিলেও অন্য একটি প্রস্তাব সমর্থন

করলো। সেটা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন। নেতারা একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হলেন। তাতে তাঁরা স্থির করলেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় শিক্ষার প্রসারের উপায় কিভাবে করা যেতে পারে।

এই সময়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য একটি প্রস্তাব করলেন, এই মুহূর্তে বারাণসীতে একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

সকলে পণ্ডিতজীর কথা একবাক্যে মেনে নিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। ঐ ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, রাণাডে এবং গোখেল।

বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে পাঞ্জাবের লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের তিলক, নাগপুরের মুঞ্জে ও খাপর্দে বাংলার আন্দোলনে মেতে ওঠেন। তাঁরা আর দূরে রইলেন না।

বারাণসী কংগ্রেস প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন: 'বাংলার চরমপন্থীরা মিঃ সি, আর, দাশের গৃহে 'স্বদেশী মণ্ডলী' গঠন করিয়া দলবদ্ধ হইয়াই কাশী কংগ্রেসে আসিলেন। তাঁহাদের হাতে ছিল স্বদেশী ও বয়কটের মশাল। কংগ্রেসের আলো-আঁধারের মধ্যে এই মশাল বেশ জ্বলিয়া উঠিল। গোখেল বলিলেন, স্বদেশী নিষ্পাপ পবিত্র জিনিস, ইহাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশ নাই; সুতরাং শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতে ইহা চলিতে পারে—সমগ্র ভারত ইহা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বয়কট, অর্থাৎ ব্রিটিশপণ্য বর্জন, এ বড় বিষম কথা। এতে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং আক্রোশ আছে। ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে এই ইংরেজ-বিদ্বেষ ত কোন মতেই চলিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষ অর্থাৎ কংগ্রেস, এই বয়কট-প্রস্তাব গহণ করিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, বাংলাদেশ ইহা সাময়িক ভাবে গহণ করিতে পারে; কেননা, বঙ্গভঙ্গ যেভাবে লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া করা হইয়াছে, তাতে বাংলার পক্ষে বয়কট সমর্থনীয় ("They—the Bengalees—had every justification for the step thy took")। বিশেষত: বাংলার

বয়কট, ১ম বাঙ্গালীদের বঙ্গ-ভঙ্গ জনিত ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করে ; ২য়, ইহা বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিবার জন্য ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে বয়কট সমস্ত ভারত গ্রহণ না করিলেও ভারতের সকল প্রদেশই বাঙ্গালীদের পশ্চাতে আছে ("All India is at their back")। তার পরে কথা, শুধু ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করিয়া যদি আমরা জাপান বা জার্মানীর দ্রব্য কিনিতে থাকি, তবে ত স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে কিছুই সাহায্য হয় না। উত্তরে বলা যায়—"ছেঁদো কথা মাথার জটা। খুলতে গেলেই বিষম লেটা।"......

বারাণসী কংগ্রেসের সভা শেষ হলো। যে-যার সব ঘরে ফিরে এলেন শান্ত মনে। অরবিন্দের মন কিন্তু শান্ত হলো না। দেশের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, কংগ্রেসের মডারেট পন্থীরা যদি কেবলমাত্র আবেদন নিবেদন নীতি নিয়ে থাকেন তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করতে অনেক দেরী হবে তিনি যে পথে চলতে চান সেই পথই শ্রেয়। এর দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামকে সচল ও কার্য্যকরী করা যেতে পারে।

তিনি আরও ভাবলেন, তাঁর এই বয়কট প্রস্তাব আজ মডারেট পন্থীরা সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে না দেখলেও আগামী দিনে দেখতে বাধ্য হবে। কারণ এর মধ্যে রয়ে গেছে সত্য পথ এবং বাস্তবানুগ উপায়। একদিন সারা ভারত এই পথে পা বাড়াবে।

অরবিন্দ ভাবলেন, এবার আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লাফিয়ে পড়তে হবে। আর কাগজ-পত্রের এবং লেখনীর আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এবার হতে হবে প্র্যাক্টিক্যাল কর্মী, থিওরিটিক্যাল উপদেশদাতা হয়ে নেপথ্যে থাকলে চলবে না। সেদিন আর নেই।

এই প্রসঙ্গে তিনি বরোদা হতে স্ত্রী মৃণালিনীকে চিঠি লিখতে

লাগলেন। তাঁর এই পত্রগুলি পাঠ করলে বোঝা যাবে তখনকার দিনে তাঁর মানসিক অবস্থা কি রকম ছিল। তাছাড়া সেই সময় স্ত্রী মৃণালিনী অভিযোগ করেন স্বামীর প্রতি, তোমার এখনো পর্যন্ত কিছু হলো না।

এই কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় স্ত্রীর মনের অবস্থা। মেয়েরা সাধারণত সাংসারিক সুখ ও বৈষয়িক অবস্থার কথা চিন্তা করে থাকে। তারা অত ত্যাগ বা আদর্শ কিংবা বাইরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। স্ত্রী মৃণালিনীর জীবনেও এর ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তিনি অরবিন্দের মধ্যে ত্যাগ ও আদর্শের সুমহান রূপ প্রত্যক্ষ করে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তাই তিনি স্বামীর প্রতি অনুযোগ করতে লাগলেন। তার উত্তরে অরবিন্দ প্রকাশ করলেন তাঁর মনোভাব। তিনি স্ত্রীর কাছে পত্র মারফৎ তাঁর তিনটি পাগলামীর কথা জানালেন: 'আমার তিনটি পাগলামী আছে। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত। আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের হিত করিতে হয়।'...

এই হলো প্রথম পাগলামীর কথা। এর দ্বারা অরবিন্দের চিত্তে স্বদেশপ্রেম ও পরদুঃখকাতরতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

এবার তিনি দ্বিতীয় পাগলামীর কথা প্রকাশ করলেন: '... সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে; পাগলামীটা এই, যে-কোনমতে ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করিতে হইবে।...ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্মে বলে—নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়। যে

যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই।'…

এবার তৃতীয় পাগলামীর কথা লিখলেন অরবিন্দ: '…পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে—না, মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে—শারীরিক বল নয়, তরবারি বন্দুক নিয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না। জ্ঞানের বল। ক্ষাত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে: সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।'…

তিনি আবার লিখছেন: '…এইভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এইভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ও সচল হইয়াছিল।'…

অরবিন্দের এই চিঠিতে তাঁর আগামী দিনের কার্য্যপ্রণালীর ছবি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ। যোগের পথে থেকে এবং যোগৈশ্বর্য্য লাভ করে আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতি করতে চান এই তিনি বলতে চেয়েছেন। এবার আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবো তাঁর পরবর্তী জীবনের দিকে।

আগে থেকেই অরবিন্দের ইচ্ছে ছিল, 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে দেশের স্বাধীনতার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন।

এবার তিনি বরোদা হতে বারীন্দ্রকে জানালেন তাঁর অনেককালের মনোবাসনা যেন বাস্তবে রূপ লাভ করে।

বারীন্দ্রও তৎপর হলেন এই বিষয়ে। যথাসময়ে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকায় অরবিন্দের অনেক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। দীর্ঘ দেড় বছর ধরে এই পত্রিকা বাংলাদেশে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রসারিত করলো। আগে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করে অরবিন্দ ও বারীন্দ্র যে কাজ আংশিক ভাবে করতে সক্ষম হয়েছিলেন এখন 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করে তদপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ শুরু করে দিলেন। এককথায় বলা যেতে পারে 'যুগান্তর' পত্রিকা বাংলা দেশে যুগান্তর নিয়ে এলো। এ যেন pen is mighter than sword কথাটির অর্থ মর্মে মর্মে সত্য হয়ে উঠলো।

যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি. পাঠ করার ফলে দেশের যুবসমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা দিল। তারা দলে দলে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে এলো। তারা বললে, ইংরাজদের বিদ্যালয়ে আর লেখাপড়া শিখবে না। দেশীয় শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করবে।

এর জন্যে প্রয়োজন হলো জাতীয় শিক্ষালয়। কলকাতার নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ভারতীয় ভাবধারায় দেশীয় যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

এই বিদ্যালয় তো প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু এর পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবে কে? সেরকম যোগ্য জাতীয়তাবাদী অধ্যক্ষের সন্ধান পাওয়া যাবে কোথায়?

অনেক চিন্তার পর নেতারা স্থির করলেন, বিপ্লবী অরবিন্দ—পণ্ডিত অরবিন্দ—অধ্যাপক অরবিন্দ এই কাজের জন্যে সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি।

তখন তাঁর কাছে পত্র গেল অনুরোধ জানিয়ে, আমরা কলকাতায় একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে তুলতে চাই। তার অধ্যক্ষের পদে আপনাকে বরণ করতে চাই। আপনি এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজী আছেন কি? বেতন কিন্তু অতি অল্প —মাত্র দেড়শো টাকা। আপনি ঐ অল্প টাকা বেতন গ্রহণ করে এই কর্মে যোগদান করতে সম্মত আছেন কিনা জানালে বিশেষ আনন্দিত হবো।

কলকাতার নেতৃবৃন্দের এই হৃদয়গ্রাহী এবং ঐতিহাসিক পত্র এসে পৌঁছলো অরবিন্দের হাতে। তিনি ঐ পত্র পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, আমি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত আছি। আপনারা কাজ আরম্ভ করে দিন। আমি ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের চাকরী অল্প টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করতে রাজী আছি।

অরবিন্দের পত্র পেয়ে এবং অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে তাঁর হৃদয়ের আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ্য করে কলকাতার নেতারা খুশী হলেন, সেই-সঙ্গে খুশী হলেন দেশবাসীরাও।

দেশবাসীরা এও জানতে পারলো যে অরবিন্দ প্রায় দু' হাজার টাকার বেতনের চাকরী ত্যাগ করে মাত্র দেড়শো টাকার বেতনের চাকরী গ্রহণ করে বাংলায় আসছেন। বাংলায় একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হচ্ছে। তার পরিচালনার ভার অর্পিত হচ্ছে অরবিন্দের ওপর। এই প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করার জন্যে রাজা সুবোধ মল্লিক এককালীন সাহায্য হিসাবে নগদ এক লক্ষ টাকা দান করতে সম্মত হয়েছেন।

এই সকল সংবাদ শুনে আনন্দিত হলো দেশবাসীরা। তাদের অন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পৃহা আরও দৃঢ়মূল হলো।

সেই সময় কলকাতার নামজাদা লোকদের নিয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের একটি বোর্ড গঠিত হলো। এই বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হলেন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। তাঁরা হলেন

বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ।

ঐ বোর্ডের অধীনে স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্যে যে সকল শিক্ষিত যুবকরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বিনয়কুমার সরকার। এঁরা মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাসমাহিনা গ্রহণ করতেন। অরবিন্দের মত গুণী-জ্ঞানী মানুষের ত্যাগের আদর্শ তাঁরাও গ্রহণ করলেন এবং দেশের জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হলেন।

সেদিনকার যুব সমাজ ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে দেশমাতার সেবায় নেমেছিলেন বলেই দেশের মুক্তিসংগ্রাম ত্বরান্বিত হতে পেরেছিল। তখন তাঁদের মনে জেগেছিল ভক্তি ও সেবার আদর্শ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুমহান নিদর্শন। এখনকার মত দলীয় রাজনীতির বিষাক্ত হাওয়া বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্লেদ তাঁদের মনের শারদ স্বচ্ছ নীলাকাশ মসীলিপ্ত করতে পারেনি। তখন দেশ ও জাতির স্বার্থ তাঁদের সামনে সুমহান আদর্শের মত প্রতিভাত হয়েছিল। তাই তাঁরা দেশের ডাকে সর্বস্ব পণ করে ভক্তির আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন জননী এবং জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচনের কাজে। সে যেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পিত আনন্দমঠের ত্যাগী সন্তানদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল মাস। কলকাতায় শিক্ষা পরিষদ গড়ে তোলার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগলো।

এবার অরবিন্দ কলকাতায় আসবার জন্যে ব্যগ্র হলেন। দীর্ঘ তেরো বছর বরোদায় থাকার পর তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। দেশজননীর আহ্বান অন্তর দিয়ে অনুভব করার পর একদিন তিনি বরোদার মহারাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ,

আমি আর এখানে চাকরী করতে পারবো না। আমাকে চিরকালের মত বাংলায় ফিরে যেতে হবে।

মহারাজা বললেন, কেন আপনি বাংলায় যাবেন? আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন। অর্থের যদি অনটন হয় তাহলে আমি তা মেটাবার ব্যবস্থা করতে পারি। বর্তমান চাকরী যদি আপনার মনোমত না হয় তাহলে আমি আপনাকে দেওয়ানের পদ দিতে পারি।

কিন্তু অরবিন্দের কাছে পদ, অর্থ বা খ্যাতির মোহ দিন দিন নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল। তিনি মহারাজাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আমাকে এখন বাংলায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে অনেক কাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মহারাজা অনেক করে বোঝালেন অরবিন্দকে বরোদায় থাকার জন্যে।

অরবিন্দ রাজী হলেন না। বললেন, আর আমাকে এখানে থাকতে বলবেন না মহারাজ। আমি আপনার প্রতি অশেষ ভাবে ঋণী। আমাকে এবার বিদায় দিন।

এবার অরবিন্দের কথায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহারাজা। তিনি আর অনুরোধ করলেন না তাঁকে বরোদায় থাকবার জন্যে। কিন্তু বললেন, আপনার জন্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকার বই কিনলুম। এগুলো আপনি নিয়ে যাবেন না?

অরবিন্দ বললেন, না, এগুলো এখন আপনার কাছে থাকুক। প্রয়োজন বোধ করলে পরে চেয়ে পাঠাবো।

বরোদা হতে ফিরে এলেন অরবিন্দ। মহারাজা তাঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন। তাই বিদায় বেলায় তার চোখদুটি বিরহকরুণ হয়ে উঠলো।

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মহামানব অরবিন্দও বুঝতে পারলেন মহারাজার বেদনার কথা। তিনিও মহারাজার মত সজল নয়নে বিদায় নিলেন। তাঁর যে সেখানে একদণ্ড থাকবার যো নেই। বিশ্বজননীর ইচ্ছায়

তিনি দেশজননীর দুঃখমোচনে বাংলায় আসছেন। তাঁকে আসতেই হবে। বিধাতার নিয়মের বিরুদ্ধে কে রুখে দাঁড়াতে পারে।

বাংলায় এসে অরবিন্দ কলকাতার 'যুগান্তর' অফিসে উঠলেন। বরোদার বেশভূষা ত্যাগ করে ধারণ করলেন খাঁটি বাঙালীর পোষাক-পরিচ্ছদ। দেশের যুবকদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন এক মূর্তিমান আদর্শ।

তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনে অনেক যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। তিনি তাদের সঙ্গে ভাঙা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তারা তাঁর চরণে প্রণাম করে চলে যাবার সময় তিনি আশীর্বাদ করলেন।

তখনো পর্যন্ত তাঁর মধ্যে লাজুক ভাব বিদ্যমান ছিল। এতকাল তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। এখন লোকারণ্যে আসার ফলে তাঁর মনে লজ্জাভাব প্রকট হয়ে উঠলো।

যুগান্তর অফিসে ছোট জায়গার মধ্যে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল অরবিন্দের।

একদিন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাঁকে দেখতে এলেন।

তিনি অরবিন্দকে বললেন, একি, আপনি এত অল্প জায়গার মধ্যে কি করে বাস করেন। আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়।

অরবিন্দ বললেন, তা একটু হয় বৈকি। তখন রাজা সুবোধ-চন্দ্র বললেন, আপনি আমার বাড়ীতে চলুন। সেখানে আপনার থাকা-খাওয়ার কোনরকম অসুবিধে হবে না।

অরবিন্দ বললেন, তাই যাবো।

তিনি আই, সি, এস্ চারুচন্দ্র দত্তের সঙ্গে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে করে চলে এলেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে।

এখানে অনেক লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। তার মধ্যে প্রধান হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

বাংলা দেশে আসার পর অরবিন্দের কর্মধারা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। যা একসময়ে ছিল পুঁথিপত্র এবং কল্পনার সামগ্রী আজ এই মুহূর্তে তা হলো হাতের কাজ—ধ্যানের বস্তু। তিনি দেশজননীর বন্ধন মোচনের জন্যে প্রাণের সাড়া জাগানো আন্দোলনে নামলেন। সেই আন্দোলনের একমাত্র অস্ত্র হলো ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্। ঐ মন্ত্রে জেগে উঠলো বাংলার নবীন-প্রবীণ সবলেই। তাঁর রাজনীতি ছিল হৃদয়ের বস্তু, বুদ্ধির চাতুর্য্য নয়। তাই তা জনমানসে ছাপ রেখে গেছে এবং দেশবাসীর ঘুমন্ত মনে এনে দিয়েছে অপরূপ সাড়াজাগানো ভাব। সেই ভাবের কাছে অতীত-পুরাতনেব ভাবগুলি একত্রে মিশে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলবার পথ নির্দেশ করে।

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে থেকে অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভাবী কর্মপ্রণালী নির্দ্ধারণ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে এসে প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি কিছু বাংলা প্রবন্ধ লেখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেগুলি ঠিকমত হতো না। তাই তিনি ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার সেগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশ করতেন।

এ ছাড়া মাঝে মাঝে অরবিন্দ ছাত্রসভায় এসে বক্তৃতা করতে লাগলেন। এই সময় তিনি একটি নির্জন ঘরে বসে ধ্যানমগ্ন হতেন। তাঁর কাছে দেশসেবাই ছিল ভগবৎ সেবা। অন্তরের ধ্যানগত উপলব্ধিতে যা কিছু সত্য দেখতেন এবং আবিস্কার করতেন তাই দেশ-জননীর কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন।

অরবিন্দের প্রবন্ধ পাঠ করে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার এলো। তারা দলে দলে নগরে ও শহরে সভা ও শোভাযাত্রা করে ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগাতে লাগলো। তাদের মধ্যে দেশজন-নীর সেবায় স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা লক্ষ্য করে খুশী হলেন অরবিন্দ। ভাবলেন, আমার বাংলাদেশে আসা বুঝি সার্থক হলো।

দেখতে দেখতে দুই বাংলা—পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় স্বাধীনতার আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় বিস্তার লাভ করলো। এর ফলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মাথা গরম হয়ে গেল। পূর্ব বাংলার ছোট লাট ব্যামফিল্ড্ ফুলার আর পশ্চিম বাংলার ছোট লাট এণ্ড্রুফ্রেজার প্রচণ্ড দমন নীতি চালিয়ে বাংলার বুকে ঘোরতর ত্রাসের সৃষ্টি করলেন। তারা হুকুমনামা জারি করলেন, এখন থেকে ছাত্রসমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী ছাত্রসমাজ ইংরাজ লাট সাহেবদের ঐ হুকুমনামায় আদৌ কর্ণপাত করলো না। তারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো।

এবাব ইংরাজ শাসক অন্য উপায় অবলম্বন করলেন। তাঁরা আদেশ দিলেন, এখন থেকে ছাত্রসমাজ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবে না।

'বন্দে মাতরম্' নিষিদ্ধ হলো।

কিন্তু জাগ্রত ছাত্র সমাজ সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করতে লাগলো। তা আরও জোরদার হলো ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিলে বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে।

অশ্বিনীকুমার দত্ত আরও বেশী করে এই স্থানটি নির্বাচিত করলেন। বৃটিশ শাসকের মনে আবও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। কারণ পূর্ববঙ্গের ওপর বৃটিশ শাসক অত্যন্ত ক্ষ্যাপা ছিলেন। সেখানে বন্দে মাতরম নিষিদ্ধ হয়েছিল।

তাই ঐ সম্মেলন বসবার সময় নেতৃবৃন্দকে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। সম্মেলনের সভাপতি হলেন এ, রসুল। অনেক নেতৃবৃন্দ এই সভায় যোগদান করেন। তাঁরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকুমার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সখারাম

গণেশ দেউস্কর, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, জে, চৌধুরী, এবং ভূপেন্দ্র নাথ বসু।

সম্মেলনের আগে সুরেন্দ্রনাথ একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। তাঁর মুখেও উচ্চারিত হলো বন্দে মাতরম্। তাই দেখে ইংরাজ পুলিশ চটে যায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়।

সুরেন্দ্রনাথকে দেখে এমার্সন উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল, 'বন্দে মাতরম্' ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তুমি কেন সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছ? তোমার মুখেই বা কেন বন্দে মাতরম্ মন্ত্র ধ্বনিত হলো?

উত্তরে নির্ভীক সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, আমি বঙ্গমাতার সন্তান। তাঁর সেবার জন্যে আমাকে এসব করতে হয়েছে।

এমার্সন বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, ও! এই জন্যে তুমি এই বেআইনী কাজ করেছ। এর জন্যে আমি তোমাকে জরিমানা করতে পারি জানো?

সুরেন্দ্রনাথ তেমনি গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, জানি।

এমার্সন তখন একটা কাগজে কি যেন ফরফর করে লিখলো। এর ফলে সুরেন্দ্রনাথকে দুশো টাকা জরিমানা দিতে হলো।

কিন্তু এতেও তুষ্ট হলো না এমার্সন। সে সুরেন্দ্রনাথকে বললে, তোমাকে আরও দুশো টাকা জরিমানা দিতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীরস্বরে বলে উঠলেন, কেন সাহেব?

—তুমি যে আমার সামনে চেয়ারের ওপর বসেছ। বসার আগে তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

—না। কিন্তু এতে করে আমি কিছু অন্যায় কাজ করিনি। চেয়ার থাকে মানুষের বসার জন্যে। আমি তাই বসেছি। এর জন্যে আপনি আমাকে জরিমানা করতে পারেন। তা করুন। আমি কিন্তু জরিমানার টাকা দিতে পারবো না।

সাহেব উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, হোয়াট্‌ !

সুরেন্দ্রনাথ কিছু না বলে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

পরে এই খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। অরবিন্দের কানেও গেল। তিনি সুরেন্দ্রনাথের নির্ভীকতার প্রশংসা করে বলে উঠলেন, Surrender not।

সেদিন ঐ সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে বরিশালে তুমুল আন্দোলন শুরু হলো। ছাত্রদের মুখে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি যত শুনতে লাগলো ইংরাজ পুলিশ ততই তাদের ওপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করলো।

এমন কি অনেক ছাত্র পুলিশী অত্যাচার হতে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে নিকটবর্তী পুকুরের জলে ঝাঁপ দিলো।

কিন্তু তাতেও নিস্তার রইলো না। জলের মধ্যেও পুলিশের আসুরিক শাসনদণ্ড নেমে এলো। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন পুলিশের লাঠির আঘাত পেল।

ছাত্ররাও অনমনীয়—অপরাজিতের ভাব দেখিয়ে দৃঢ় স্বরে বলতে লাগলো—'বন্দে মাতরম'—'বন্দে মাতরম্', 'ইংরাজ রাজ ধ্বংস হোক' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

এভাবে সেদিন বরিশাল এমন কি সারা পূর্ববঙ্গ নবীন উদ্দীপনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়যাত্রা আর এক ধাপ এগিয়ে গেল।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা ন্যাশন্যাল কলেজে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা আরম্ভ হলো। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে এই কলেজে শিক্ষাপর্ব শুরু হলো। অরবিন্দ ইতিহাস ও অর্থনৈতিক বিষয় পড়াতে লাগলেন। তাঁর পড়াবার ভঙ্গী ছিল অসাধারণ। একবার শুনলে আর দ্বিতীয় বার শোনবার দরকার হতো না। এমন ধ্যানগম্ভীর এবং অচঞ্চল ভাব নিয়ে পড়াতেন যে ছাত্রদের অসংযত মন মুহূর্তে শান্ত হয়ে যেতো।

কেবল পাঠ্য বিষয় পড়াতেন এমন নিয়ম ছিল না। পাঠ্য বহির্ভূত অনেক বিষয়ও তিনি পড়াতেন। ইংরাজী কাব্য, পাশ্চাত্ত দর্শন প্রভৃতি বিষয় ছিল তাঁর অধ্যাপনার অঙ্গ। তাঁর কণ্ঠে ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি শুনলে মনে হতো তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন ঘোষ আবৃত্তি করছেন।

এমন সংযত ও শান্ত কণ্ঠ অনেক অধ্যাপকের কাছে আদরণীয় বস্তু ছিল। তিনি যখন ক্লাসে পড়াতেন তখন অনেক ছাত্র এবং অধ্যাপক পাঠ ফেলে তাঁর ক্লাসে এসে পাঠ শুনতেন।

পাঠ্যবস্তুর মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে তিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারার প্রচার করতেন। তিনি বুঝতে পারলেন, দেশের তরুণরা যদি ভারতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট না হতে পারে তাহলে তাদের মনে জাতীয়তার ভাবধারা জাগ্রত হতে পারবে না। আর এই জাতীয় ভাবধারা জাগ্রত হলে তবেই তারা জাতির জন্যে—তার স্বার্থের অনুকূলে সংগ্রাম করতে এগিয়ে আসবে।

অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবী। কর্মে বিপ্লবীর তুলনায় তিনি ছিলেন চিন্তায় বিপ্লবী। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পক্ষপাতী ততটা ছিলেন না যতটা ছিলেন তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার। বারীন্দ্রকুমারকে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে তার কাজে সাহায্য করলেও তখনো পর্যন্ত তিনি সক্রিয় বিপ্লববাদ মনে-প্রাণে অনুমোদন করতে পারেননি। তিনি চেয়ে ছিলেন নিরস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শাসক ইংরাজদের বিরুদ্ধে। তা ব্যর্থ হলে তখন বিপ্লবের কথা বরং চিন্তা করা যেতে পারে।

অরবিন্দ দেখলেন ভারতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারাকে নগর হতে গ্রামে এবং গ্রাম হতে গ্রামান্তরে প্রচার করতে হলে চাই একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। সেই সময় বিপিনচন্দ্র পাল একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তার নাম ছিল 'নিউ ইণ্ডিয়া।' অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে বোঝাপড়া করে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার জায়গায়

'বন্দে মাতারম্' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন ! এই পত্রিকাটি ইংরাজীতে প্রকাশিত হতে লাগলো এবং এটি ছিল সাপ্তাহিক। এতে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন প্রসঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো।

'বন্দে মাতরম' প্রথমেই অরবিন্দের লেখা Absolute Autonomy free from British control নামে প্রবন্ধ এবং Draft Resolution নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো।

বন্দে মাতরমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অরবিন্দ লিখলেন : '...প্রেম জীবন্ত হয়ে ওঠে যখন তখন ভাগবত মহিমা দেশরূপা মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা, নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছা, আরাধনা এবং সেবার মধ্যে দিয়েই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়।'...

এরপর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রসঙ্গে লিখলেন : '...আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের দাবী এই, যে জাতি হিসাবে আমাদের ধ্বংস অবাস্তব, আমরা বেঁচে থাকবই, কোন শক্তি আমাদের বাধা দিলে, তাকে ন্যায়ের বিচার গ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রকৃতির নিয়ম আর ভাগবত নিয়ম অভিন্ন, এবং এইভাবে সেই শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই... ।'

খসড়া প্রস্তাবে লিখলেন :

'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রসঙ্গে প্রস্তাব—আমরা শোষণকারী বৃটিশ শাসনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি। কারণ এই শাসনে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যা, শিল্পে মন্দা প্রভৃতি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতি হচ্ছে না। ফলে দেশবাসীদের দুঃখের সীমা নেই। এই কারণে আমরা ঠিক করেছি বিদেশী দ্রব্য বর্জন করবো যাতে করে বৃটিশরা আর আমাদের দেশে সর্বনাশ ডেকে না আনতে পারে।

'আমরা ইংরাজদের বিচার পদ্ধতির প্রতিও বীতশ্রদ্ধ। কেননা

এ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ; বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি। এই কারণে আমরা ইংরাজদের আদালত বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এরূপ করলে বর্বরোচিত ইংরাজ শাসনকে পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব হবে।'...

দেখতে দেখতে 'বন্দে মাতরম'-এর জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জনসাধারণ যখন জানতে পারলো 'বন্দে মাতরম'-এ ছদ্ম-নামে অরবিন্দের লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তখন তারা আগ্রহ সহকারে পত্রিকাখানি পাঠ করতে লাগলো।

পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক বলে অনেকে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলো না আগামী সংখ্যার জন্যে। তাই তারা দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' পাবার জন্যে আকুলতা প্রকাশ করতে লাগলো।

দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে যথেষ্ট অর্থের দরকার হয়। অতো অর্থ পাওয়া যাবে কোথায় ?

অরবিন্দের একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং গুণের সমঝদার রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক এগিয়ে এলেন এই মহৎ কাজে। তিনি নগদ অর্থ সাহায্য করলেন, সেই সঙ্গে তাঁর ক্রীক্ রোর কাছে ক্রীক্ লেনের বাড়ীখানি 'বন্দে মাতরম্' অফিসের জন্যে ছেড়ে দিলেন।

রাজার কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাহায্য লাভ করে খুশী হলেন অরবিন্দ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

সাপ্তাহিক 'বন্দে মাতরম্' এবার দৈনিক 'বন্দে মাতরম'এ রূপান্তরিত হলো। জাতীয়তাবাদী যুবকগণ দৈনিক 'বন্দে মাতরম' পেয়ে খুশী হলেন। এতদিন ধরে তাঁরা যার পথ চেয়ে বসেছিলেন এবার তা ফলে-ফুলে পূর্ণ হলো।

দিন দিন পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো দেখে এক দল জাতীয়তাবাদী যুবক স্থির করলো, অরবিন্দের নেতৃত্বে এটিকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড্ সংস্থায় রূপান্তারিত করতে পারলে এর ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে।

হলোও তাই। লিমিটেড কোম্পানী হওয়ার পর এর জনসমাদর দিন দিন বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ারগুলি দ্রুত বিক্রী হয়ে গেল।

কোম্পানীর ডিরেকটর পদে যাঁরা নিযুক্ত হলেন তাঁরা হচ্ছেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিন চন্দ্র পাল, হরিদাস হালদার, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁ, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রজত রায়।

এর প্রধান সম্পাদক হলেন বিপিনচন্দ্র পাল আর সম্পাদক গোষ্ঠীতে রইলেন অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এরা সকলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন সেগুলি অরবিন্দ দেখে দিতেন প্রকাশ করার আগে।

যোগ্য পরিচালনার গুণে এবং মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে 'বন্দে মাতরম্' অচিরে জনপ্রিয়তা লাভ করলো। ভারতের জাতীয়তা-বাদের ভাবধারা প্রচারে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল সকলের তুলনায় বেশী এবং তার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন জাতীয়তাবাদের কবি এবং ঋষি অরবিন্দ। সত্যদ্রষ্টা এবং ঋষি কবি বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে অমূল্য ও প্রাণবন্ত জাতীয় ভাবধারার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন সেই মহান ভাবধারাকে জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিলেন অরবিন্দ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'বন্দে মাত-রম্' পত্রিকার মারফৎ।

'বন্দে মাতরম্'-এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে লাগলো। নবীন জাতীয়তাবাদীরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবল উৎসাহ পেতে লাগলো এই পত্রিকা মারফৎ। উৎসাহ বোধ করলেন না প্রবীণ মডারেট পন্থীরা। তাঁরা নবীন জাতীয়তাবাদী দল হতে পৃথক হয়ে

গেলেন। * সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অরবিন্দের জাতীয়তার আদর্শ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবধারা গ্রহণ করতে অপারগ হলেন। তিনি নবীন জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বপদ হতে পদত্যাগ করলেন। তখন নবীন জাতীয়তাবাদীগণ বিপিনচন্দ্র পালকে ঐ শূন্য আসনে বসালেন।

বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে অরবিন্দের মতের পার্থক্য যথেষ্ট ছিল তবু তিনি বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন বলে তাঁকে ঐ কাজের গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত করা হলো।

অরবিন্দ নেপথ্যে থেকে ছদ্মনামে 'বন্দে মাতরম্'-এ প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব করার বাসনা ছিল না। তিনি জানতেন দেশ হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়। দেশের স্বার্থ সকলের আগে দেখা দরকার।

অরবিন্দের লেখার গুণে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার চাহিদা দিন দিন বেড়ে চললো। তিনি ইচ্ছে করলে একে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারতেন কিন্তু তা করলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্য, নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ছিল না। তাই 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত হবার এক বছর পর অরবিন্দ লিখলেন: 'এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে, কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত মর্জির জন্যে নয়। সমস্ত জাতির দুঃসময়ে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং এর একটা বাণী আছে যার প্রতিবাদ করার মত কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই ···এ দাবী করছে এই বলে যে এ নাকি জনসাধারণের ইচ্ছাকে ভাষা দিতে পারে।'···

বাংলায় 'যুগান্তর' ও ইংরাজীতে 'বন্দে মাতরম্' দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করলো এবং ভারতবাসীর মনে জাতীয়তার ভাবধারা নিয়ে এলো।

একদিন চন্দননগর থেকে একজন স্কুল শিক্ষক 'বন্দে মাতরম্'

পত্রিকাকে প্রশংসা করে একটি পত্র লেখেন। শিক্ষকের নাম উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় ঐ চিঠিটি পাঠ করার পর আনন্দিত হলেন অরবিন্দ। তিনি তখুনি শ্যামসুন্দরকে ডাকলেন।

শ্যামসুন্দর এলো। অরবিন্দ বললেন, দেখেছ এই চিঠিটা? শ্যামসুন্দর অরবিন্দের হাত হতে পত্রিকাখানি নিয়ে মনোযোগ দিয়ে চিঠিটি পাঠ করলেন।

অরবিন্দ প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখলেন?

শ্যামসুন্দর বললেন, ভাল।

অরবিন্দ বললেন, শুধু ভাল—বলুন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ!

একটু থেমে আবার বললেন, আপনি এখুনি ওঁকে একখানা চিঠি লিখে দিন। উনি যেন মাষ্টারীর চাকরী ত্যাগ করে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় যোগ দেন।

তাই হলো। শ্যামসুন্দর পত্র লিখলেন উপেন্দ্রনাথকে। পত্র পাঠ মাত্র উপেন্দ্রনাথ দেখা করলেন অরবিন্দের সঙ্গে। অরবিন্দ উপেন্দ্রনাথের মধ্যে সুপ্ত সাংবাদিক প্রতিভা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন। বললেন, আপনি এখন থেকে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকুন। আপনাকে আর স্কুল শিক্ষকের কাজ করতে হবে না।

উপেন্দ্রনাথ রাজী হয়ে গেলেন। পরে তিনি 'বন্দে মাতরম্' ও 'যুগান্তর' দু'টি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়মিতভাবে লিখতে লাগলেন।

'বন্দে মাতরম্' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা পাঠ করার ফলে দেশের গণচেতনা ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। চারিদিকে শুরু হয়ে গেল স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকায় ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন।

এর ফলে বৃটিশ সরকার মহা ফাঁপরে পড়লেন। তাঁরা ভাবলেন,

এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে রয়েছে 'যুগান্তর' পত্রিকা। সুতরাং সর্বপ্রথম এর ওপর আঘাত এলো। পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও কর্মকর্তা গ্রেপ্তার বরণ করলেন ইংরাজ পুলিশের হাতে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, তাঁরা নাকি রাজদ্রোহ প্রচার করছেন।

যুগান্তর প্রেসের মালিক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। লেখক ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত।

মুদ্রাকর হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম পত্রিকায় মুদ্রিত হতো।

ইংরাজ পুলিশ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করে।

প্রেস বাজেয়াপ্ত হবার ভয়ে অবিনাশচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করে মামলা চালালেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তা করলেন না। অরবিন্দের নির্দেশে তিনি বিদেশী সরকারের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না।

নির্দিষ্ট দিনে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিচার আরম্ভ হলো। আদালত লোকে লোকারণ্য।

ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে বিচার আরম্ভ হলে ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, আমি দুঃখিনী জন্মভূমির জন্যে যা কর্তব্য বলে বুঝেছি তাই করেছি। আমিই যুগান্তরের প্রকাশক এবং সম্পাদক। এখন আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

এরকম নির্ভীক জবাব আর কোন আসামী দিতে পেরেছেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে?

ভূপেন্দ্রনাথ নিজে পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলে তাঁর মনে এত তেজ—এমন প্রচণ্ড সাহস।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাহসিকতা পূর্ণ জবাব বৃটিশ বিচারকের কানে সম্পূর্ণ ভাবে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলে বোধ হলো। তিনি রায় দিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে, তাঁর দু'বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড হলো।

বিচারকের কথা শুনে হাসতে হাসতে কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন ভূপেন্দ্রনাথ।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাদণ্ড উপলক্ষ্যে অরবিন্দ লিখলেন, '…আঘাত ভগবানের হাতুড়ি, ঘা' দিয়ে তিনি আমাদের এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করছেন এবং আঘাতই পৃথিবীতে তাঁর শক্তিলীলার যন্ত্রস্বরূপ। তাঁর কর্ম্মশালায় আমরা লৌহমাত্র—তাঁর আঘাতে আমাদের ধ্বংস হয় না, হয় পুনর্গঠন।…'.

বিচারে অব্যাহতি পেলেন অবিনাশচন্দ্র।

'যুগান্তর' পত্রিকার মামলা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ'-এ লিখেছেন: '…'যুগান্তর' মামলা আরম্ভ হলে (২২শে জুলাই, ১৯০৭) ভূপেন্দ্রনাথ আদালতে বিচারকের উদ্দেশ্যে এক স্মরণীয় বিবৃতি দাখিল করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, "I, Bhupendra Nath Datta, do hereby beg to state that I am the Editor of the Journal 'Jugantar' and I am solely responsible for all the articles in question. I have done what I have considered in good faith to be my duty to my country. I do not wish the prosecution to be put to the trouble and expense of proving what I have no intention to deny; I do not wish to make any other statement or to take any further action in the trial." অর্থাৎ "আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, আমিই 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক এবং আমিই উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির জন্য সর্বাংশে দায়ী। আমি সরল বিশ্বাসে আমার দেশের প্রতি কর্তব্য বলে যা ভাল বুঝেছি, আমি তাই করেছি। যা অস্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার জন্যে আদালতের অনর্থক অর্থব্যয় বা শক্তি ক্ষয় হোক আমি তা চাই

না। আমি আর কোনো বিবৃতি দিতে বা এই বিচারে আর কোনো অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই ' .....

'ভূপেন্দ্রনাথ প্রশান্ত চিত্তে হাসতে হাসতে দেশের জন্য কারাবরণ করলেন। আত্মত্যাগের সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য ভাই বলে বাঙালী সমাজ ও ভারতবাসী ভূপেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় পেলো। ২৫শে জুলাই 'বন্দে মাতরম্' পত্রে স্বয়ং অরবিন্দ তাঁর কারাবরণ উপলক্ষে "One ... for The Al...r" নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে মানুষের ললাটে দুঃখ অনিবার্য। কিন্তু সকল অত্যাচার ও নিষ্পেষণ প্রশান্ত চিত্তে এবং উন্নত শিরে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই শুরু হবে আমাদের আত্মার বিজয় অভিযান পরদিন ২৬শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ ও তেজঃদৃপ্ত আচরণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রে আরও একটি বড় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন মডারেটপন্থী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ভূপেন্দ্রনাথ ও সরকার উভয় পক্ষকেই নিন্দা করে সম্পাদকীয় টিপ্পনী লিখলো ভূপেন্দ্রনাথের এই কারাবরণের গভীর তাৎপর্য তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো না। কিন্তু 'অমৃতবাজার' বা আরও দু'একখানি মডারেটপন্থী পত্রিকা বাদ দিলে বাংলার জাতীয়তাবাদী সকল পত্রিকাই ভূপেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করলো।'......

'যুগান্তর' পত্রিকার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র একটি মামলা হয়নি। এরপর আরও অনেক মামলা হয়েছে। প্রত্যেকবারই এক এক জন নির্ভীক দেশসেবক নিজের নাম দিয়েছে। ইংরাজ শাসকের ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করলো না।

দেখতে দেখতে যুগান্তরের জয়যাত্রা চারিদিকে রটে গেল। সারা ভারতে মানুষ দেশের মুক্তি সংগ্রামে মেতে উঠলো। কংগ্রেসের নরমপন্থীরা দেখলেন যে তাঁদের আবেদন-নিবেদনের নীতি এখন

সম্পূর্ণ অচল। তাকে আর ধরে রাখা যাবে না। ফলে অরবিন্দের প্রচারিত উগ্র জাতীয়তাবাদ সারা ভারতে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো।

অরবিন্দ জানতেন যে কংগ্রেসের নরমপন্থীরা তাঁর এই প্রকার বৈপ্লবিক ব্যবস্থা মেনে নেবেন না। তবু তিনি নিজের আদর্শে অটল-অচল রইলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থীদের দিয়ে নিজেব মতামত মানিয়ে নেবাব প্রত্যাশায় তিনি কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের আয়োজন করলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। অরবিন্দ চাইলেন লোকমান্য তিলক হবেন এই কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মডারেট-পন্থীগণ তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, তিলক জেল খেটেছেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নন।

তখন কথা উঠলো, কে তাহলে সভাপতি হবে? অনেকে তাঁর কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন দাদা-ভাই নৌরজীকে সভাপতি করা হোক।

জাতীয়তাবাদী নেতারা এতে আপত্তি করলেন না।

দাদাভাই নৌরজী তখন বিলেতে ছিলেন। তাঁর কাছে খবর গেল। তিনি এলেন ভারতে। তিনিই হলেন কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিদেশী দ্রব্য বর্জনেব প্রস্তাব এবং স্বরাজের দাবী স্বীকৃত হলো।

স্বরাজের দাবী করা হলো বটে কিন্তু এ স্বরাজ পূর্ণ স্বরাজ নয়। নিতান্তই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।

এই দেখে চরমপন্থীরা গেলেন চটে। পরে তাঁরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির সমর্থন আদায় করেন:

(১) এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ইংরাজ রাজত্বে দেশীয় জনসাধা-

রণের আশা-আকাঙ্খা সাফল্যলাভ করতে পারছে না। সরকার পক্ষ থেকে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ রোধ করার জন্যে দেশের জনসাধারণ যে বয়কট আন্দোলনে নেমেছে তা যুক্তিযুক্ত এবং আইনসম্মত।

(২) এই কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করছে এবং তা সার্থক করার জন্যে দেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে দেশবাসীকে উৎসাহ দিচ্ছে যাতে তারা দেশীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে আমদানী করা বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করতে পারে।

(৩) এখন দেশে এমন সময় এসেছে যখন দেশবাসীরা গভীর ভাবে সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করবে। এই শিক্ষা হচ্ছে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই। এবং একে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। বিভিন্ন জায়গায় লাইব্রেরী এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। এগুলি হবে জাতীয় ভাবধারাকে ভিত্তি করে

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ। এই সালের গোড়া থেকেই সারা দেশে চরম-পন্থীদের ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য চলতে লাগলো। তারা দিনের পর দিন বিপ্লবের কাজকে স্বাগত জানাতে লাগলো। অরবিন্দও তাদের মত সমর্থন করলেন।

ঐ সালের মে মাসে ভারত সরকার পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়কে কৃষক আন্দোলনের জন্যে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠালেন।

অরবিন্দ তখন কলকাতায় রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তাঁর কাছে টেলিগ্রাম এলো। তখন তিনি নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে তুললো 'যুগান্তর' পত্রিকার জনৈক কর্মী। এর জন্যে তিনি বেশ বিরক্ত বোধ করলেন।

পরক্ষণে তাঁর মনের বিরক্তিভাব কেটে গেল। তিনি কাগজ কলম নিয়ে ইংরাজীতে লিখলেন ঃ

'বৃটিশ-ভারত হতে লালা লাজপত রায়কে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। এর আর কোন সমালোচনার দরকার নেই। তাঁর গ্রেপ্তার উপলক্ষে সকলরকম প্রতিবাদসভা নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রতিবাদ সভা, বক্তৃতা কিংবা লেখবার দিন আজ নয়। ইংরাজ আমাদের শক্তি পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ করেছে। আমরা সেই চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করলুম। পঞ্চ নদের মানুষ—সিংহের জাত তোমরা—যারা তোমাদের অস্তিত্বকে ধূলোয় মেশাতে স্পর্দ্ধা করে তাদের তোমরা দেখিয়ে দাও যে একজন লাজপত রায়কে নিয়ে গেলে তার জায়গায় শত লাজপত রায় উঠে দাঁড়াবে। তোমাদের কণ্ঠনিঃসৃত ভীম রণহুঙ্কার —"জয় হিন্দুস্থান"—তাদেরকে বিচলিত করে তুলুক।'

পরের দিন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দের এই লেখাটি দেখে জনসাধারণের মনে বিপ্লবের ভাব জেগে উঠলো। দেখতে দেখতে বহু কাগজে তেজস্কর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো। সেগুলি পাঠ করে ইংরাজ শাসক ক্রুদ্ধ হলেন।

এরপর 'যুগান্তর'এর মুদ্রাকর বসন্ত ভট্টাচার্য্য রাজদ্রোহের অপরাধে দু'বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও গ্রেপ্তার হলেন। তিনি তাঁর পত্রিকা 'সন্ধ্যা'য় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার নাম—'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'।

ইংরাজ পুলিশদের মতে ঐ প্রবন্ধটি ছিল নাকি রাজদ্রোহমূলক।

বিচারের সময় ব্রহ্মবান্ধব আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার করলেন। পরে নিজে পুরুত সেজে মুদ্রাকরকে বর সাজিয়ে আদালতে প্রবেশ করেন।

চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সন্ন্যাসীর এই রসিকতা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, জানো, তোমার এই প্রকার তামাসা দেখানোর জন্যে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারি?

নির্ভীক ব্রহ্মবান্ধব একটুও টললেন না শাস্তির ভয়ে। তিনি বিচারকের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললেন, 'আমি এই মামলায় কোন

অংশ নিতে চাই না। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্বরাজের সাধনায় আমার সামান্য শক্তিতে যা করেছি কোনও বিদেশীর কাছে তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে আমি প্রস্তুত নই।'…

পরে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মুদ্রাকরের ওপর দণ্ডাজ্ঞা আসে। দু'বছরের জন্যে তাঁর দণ্ডের আদেশ হলো।

'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে শাস্তি দেওয়ার পর এবার ইংরাজ পুলিশের নজর পড়লো 'বন্দে মাতরম্'-এর ওপর।

এতকাল এই কাগজে অনেক অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছিল। এতদিন ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি এদিকে পড়েনি।

এবার পড়লো। ঐ পত্রিকার মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষ এবং লেখক অরবিন্দের ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী করা হলো। তাঁরা দু'জনেই ধরা পড়লেন এবং কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে তাঁদের বিচারের ব্যবস্থা করা হলো।

বিচারের দিন বহু লোক এসে আদালত-কক্ষপূর্ণ করে দেখলো। নবীন উকিল-ব্যারিষ্টাররা অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করলো।

অনেকের অনুরোধে অরবিন্দ নিজের পক্ষ সমর্থন করতে রাজী হলেন। কিন্তু মামলা পরিচালনার ব্যাপারে উদাসীন রইলেন।

নির্দিষ্ট দিনে 'বন্দে মাতরম্'-এর ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ মামলা শুরু হলো। সরকার পক্ষ হতে অরবিন্দের সকল রচনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে সাক্ষীসাবুদ ডাকা হলো। বিপিনচন্দ্র পাল অন্যতম সাক্ষীরূপে এলেন। কিন্তু তিনি সাক্ষী দিতে গররাজী হলেন।

সরকার তখন তাঁর ওপর রেগে গিয়ে আদালত অবমাননার দায়ে ছ'মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

তাঁর দণ্ডের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাই শুনে ছাত্রদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন দেখা গেল।

মাত্র পনেরো বছরের সুশীল সেন একজন ইংরাজ পুলিশ সার্জেন্টকে তার ঘোড়ার ওপর উঠে চড় মারলো।

সুশীল সেনের দণ্ড হলো।

কিংসফোর্ড তাকে পনেরো ঘা বেত দেবার আদেশ দিলেন। তাঁর সামনে এ কাজ সম্পন্ন হবে।

হলোও তাই। হাকিমের সামনে সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত মারা হলো।

অর্দ্ধমৃত অবস্থায় সে ধরাশায়ী হলো।

ওদিকে 'বন্দে মাতরম্' মামলার তোড়জোড় হতে লাগলো। অরবিন্দ এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। এবার তিনি চলে এলেন প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে। এই সময় তিনি বেশ অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন ন্যাশনাল কলেজে অধ্যক্ষ থাকলে তাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে নামা সম্ভব হবে না। তা যদি করতে যান তাহলে সরকার হয়তো কলেজটি বন্ধ করে দিতে পারে।

এই আশঙ্কায় অনেকের কাছে মত চাইলেন অরবিন্দ। তাঁরা তাঁকে প্রকাশ্য ভাবে কাজ করতে নিষেধ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। অধ্যক্ষের পদ হতে সরে দাঁড়াতে মনস্থ করে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর পদত্যাগ-পত্র পাঠালেন।

পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হলো।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলেজের ছাত্ররা তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানালো। তার উত্তরে বিপ্লবী অরবিন্দ বেশ সুন্দর একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন।

তিনি বললেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাও। আমিও তোমাদের কাছে কিছু বলবো। অনেক আশা নিয়ে এবং বেশী বেতনের চাকরী ত্যাগ করে আমি এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

যোগদান করেছিলুম। এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় যুবকদের ভারতীয় ভাবধারায় গড়ে তুলবো এই ছিল আমার জীবন স্বপ্ন। এই স্বপ্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করেছি। এই কাজ আমার একার জন্যে নয়—বাংলামায়ের জন্যে। তাঁর সন্তানগণ যাতে মানুষ হয়ে তাঁ' দুঃখ ঘোচাতে পারে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। তোমরা হচ্ছ দেশের ভবিষ্যৎ—জাতির ভবিষ্যৎ। দেশ তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু চায়। এখন দেশের বড় দুঃসময় তোমরা নিজেদের যোগ্য করে তোল যাতে বাংলামায়ের দুঃখ দূর করে তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও গৌরবময় করে তুলতে পারো। আমিও ভবিষ্যতে এখানে এসে তোমাদের সেই গৌরবময় কার্য্যাবলী দেখে আনন্দ বোধ করবো।'…

'বন্দে মাতরম্' মামলার কথা শুনে দেশের জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের ওপর ইংরাজ সরকারের নির্মম ব্যবহার দেখে রুষ্ট হন। তিনি জাতীয় বীর অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতির তরফ থেকে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তার সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশ বন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাই নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি' নর-দেব চির রাত্রিদিন
তপোমগ্ন ; যার লাগি' কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে

গিয়াছেন সংকট-যাত্রায় ; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ;……'

'বন্দে মাতরম্' মামলার শুনানী আরম্ভ হলো। আদালতের ভেতরে ও বাইরে লোকে লোকারণ্য জনসাধারণের এত ভীড় দেখে মনে হচ্ছে দেশবাসীরা তাঁকেই সমর্থন করতে এসেছে। ঐ দৃশ্য দেখে অরবিন্দ বুঝতে পারলেন, বাঙ্গালী এবার জেগেছে। তার জাতীয় চেতনা ফিরে পেয়েছে। এতদিন পরে তার ঘুম ভেঙ্গেছে।

আদালতে বিচার হচ্ছে, জনসাধারণ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মামলার পক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছে কিন্তু অরবিন্দ ধীর-স্থির—নির্বিকার। তাঁকে দেখে মনে হলো, তিনি যেন একটি অটল পর্বত।

বিচারে অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে খালাস পেলেন। ইংরাজ সরকার নানাপ্রকার কৌশল করেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন রকম অভি-যোগ আনতে সক্ষম হলেন না।

দেশের জনগণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো যখন তারা শুনলো অরবিন্দ নিসর্ত মুক্তিলার্ভ করেছেন।

এতদিন অরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। এবার জন-সাধারণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে তৈরী হলেন। তার পক্ষে ঐসময় জনসাধারণের সামনে আসার একটা কারণও ছিল। সেটা আর কিছুই নয় বিপিনচন্দ্র পাল তখন জেলে ছিলেন। তাই অরবিন্দ নিজে এসে দাঁড়ালেন জনগণের সামনে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অরবিন্দ এলেন মেদিনীপুরে। তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁরই সহকর্মী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং ললিত ঘোষাল। উদ্দেশ্য বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান করা।

মেদিনীপুরে এসে অরবিন্দ শুনতে পেলেন চন্দননগরে মেয়রের

ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই খবর পেয়ে অরবিন্দ ভাবলেন, এবার বাংলায় সত্যিই বিপ্লবের বাস্তব পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ করে বাঙালীকে যেমন ভাবে উত্তেজিত করেছে তার পরিণাম এখন দেখা যাচ্ছে হাতে-নাতে।

চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার পেছনে বিপ্লবী অরবিন্দের পরামর্শ ছিল। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র কাননগো লিখেছেন :

'ইতিমধ্যে চন্দননগরের মেয়রকে মারবার জন্য একটা বোমার ফরমায়েস বারীন করে পাঠাল। আমি কিছুতেই তখন বুঝতে পারি নি যে···সকল প্রদেশে এক সঙ্গে terroristic work করবার মত সামর্থ্য লাভ করবার আগে কেন বৈপ্লবিক হত্যা করবার খেয়াল ক-বাবুর (অরবিন্দের) মত মানুষের মাথায় জেগে উঠেছিল।···

'তাদের ক-বাবুর (অরবিন্দের) ওপর অন্ধ বিশ্বাস। অতবড় জ্ঞানী লোক যখন আদেশ দিয়েছেন, তখন এটা উচিত না-হয়ে যায় না। পরে এই কাজটার অ-ন্যায্যতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করতে গিয়ে শুনেছিলাম—ক-বাবুর (অরবিন্দের) কাছে 'বাণী' এসেছিল। সেই 'বাণী' বারীণ জারী করেছিল।'···

এদিকে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে নরমপন্থী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এসেছেন দলবলসহ। চরমপন্থীদের ব্যবহার দেখে বিষণ্ণ হলেন তাঁরা। তাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় আসবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি মেদিনীপুরের যে জায়গায় উঠেছিলেন সেখানে অরবিন্দকে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠিটি নিম্নরূপ :

Midnapur

My dear Aurobindo Babu,

I am here. Will you kindly, if convenient come over with Shamsunder Babu and Lalit Babu. Kristo Babu is also coming here.

yours sincerely,
Surendra Nath Banerjee.

সুরেন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন বটে কিন্তু অরবিন্দের সঙ্গে দেখা হলো না। তার আগেই সম্মেলন আরম্ভ হয়ে গেল। সভায় চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা চলতে লাগলো।

এইসব ঝামেলা হতে মুক্ত হবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ নিজে আগ্রহী হয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্যে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা বললেন। তিনি বললেন, আমরা উভয় সম্প্রদায় যদি একত্রে মিলিত হই তাহলে শীঘ্র একটা শাসন সংস্কার হবে এবং ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগবে। সেই সঙ্গে তিনি এমন কথাও বললেন, এর দ্বারা আমরা দু'তিন বছরের মধ্যে হয়তো স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে সমর্থ হবো।

সুরেন্দ্রনাথ নিজে অনেককরে বোঝালেন অরবিন্দকে। এর পর অরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রও অরবিন্দকে বোঝালেন। তিনি ছিলেন নরমপন্থীব মানুষ এবং সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত।

এত সব কথা শুনেও বিন্দুমাত্র টললেন না অববিন্দ। নিজের মতে রইলেন স্থির এবং অচঞ্চল। কাবণ তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন যে নরমপন্থীরা পূর্ণ স্বরাজ চায় না।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্তিতর্কের পর শেষকালে বললেন অরবিন্দ, বৃটিশ শাসনের বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতা না হলে দেশের কোন উপকার হবে না, হতে পারে না। রিফর্ম বা সংস্কার তা যত ভালই হোক না কেন তা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস মাত্র, তা যতই মর্য্যাদাপূর্ণ হোক তবু এর কোন মূল্য নেই। কারণ এ ইংরেজের অনুগ্রহের দান ছাড়া অন্য কিছু নয়। যে জিনিষ আমাদের নিজেদের শক্তিতে উপার্জিত হবে না, সে জিনিষ রাখবার শক্তি আমরা কোনদিনই অর্জন করতে পারবো না।

অরবিন্দের মতের জয় হোল। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল-অচল থেকে নতুন উৎসাহে ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে বীডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, হুগলী প্রভৃতি জায়গায় বক্তৃতা দিলেন।

বীডন স্কোয়ারে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি বললেনঃ 'আমি মনে করেছিলুম কখনো প্রকাশ্যে বক্তৃতা করবো না। এর কারণ ছিল। অতি শৈশবে আমি ইংলণ্ড গিয়েছিলুম এবং দীর্ঘকাল সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছি। মাতৃভাষা শেখবার সুযোগ পাইনি—মাতৃভাষায় তাই আমি কথা বলতে পারি না। সেইজন্যে যে ভাষা আমার নয়, আপনাদেরও নয়, সেই ভাষায় দেশবাসীর সামনে বক্তৃতা করার চেয়ে মৌন থাকাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।'...

অরবিন্দের কথা শুনে সকলে বললে, আপনি যে ভাষায় বক্তৃতা দিলে ভাল মনে করেন সেই ভাষায় বক্তৃতা দিন। আমরা ঠিক শুনতে পা।বো।

অরবিন্দের ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দেওযা অভ্যাস ছিল। তাই তিনি ঐ ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ শ্যামসুন্দর পরে অনুবাদ করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দেব ২৬শে ডিসেম্বব সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। বাংলার চরম পন্থীরা এই সুযোগ অরবিন্দকে নিয়ে সুরাট অভিমুখে রওনা হলেন। সঙ্গে গেলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

সারা ভারতের মডারেট পন্থীরা রাসবিহারী ঘোষকে এই অধিবেশনে সভাপতি মনোনীত করলেন। কিন্তু চরমপন্থীরা চাইলেন তিলক এই অধিবেশনে সভাপতি হোক। এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হলো উভয় পক্ষে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাসবিহারী ঘোষই সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

এই দেখে জাতীয়তাবাদী দল অরবিন্দর নেতৃত্বে সুরাটে একটি পৃথক সভার আয়োজন করলেন। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে বালগঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি রূপে মনোনীত করলেন।

পরে তাঁরা তিলককে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কংগ্রেসের সভামণ্ডপে। এনেই তাঁরা ঘোষণা করলেন, এই অধিবেশনে সভাপতি হচ্ছেন বালগঙ্গাধর তিলক।

পরে তিলক সভাপতির বেদীতে উঠে অভিভাষণ পাঠ করতে লাগলেন।

তিলক একবার সভার হালচাল দেখে নিলেন। তিনি ভাবলেন, এই বেদীতে বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। এখুনি দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই তিনি তাঁর ভাষণের শেষাংশ থেকে পাঠ করা আরম্ভ কবে দিলেন, We want absolute autonomy free from British Control

তিলকের মুখে absolute autonomyর কথা শুনে মডারেট পন্থীরা লাফিয়ে উঠলেন। তাঁরা সকলে এক সঙ্গে বললেন, না এরূপ প্রস্তাব কখনো মেনে নেওয়া হবে না।.

এই সঙ্গে প্রশ্ন উঠলো সভাপতির নির্বাচন নিয়ে বৈধতা প্রসঙ্গে।

তাই শুনে বিপ্লবী অরবিন্দ বললেন, বৈধতা-অবৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হোক প্রকাশ্য ভোটে।

কিন্তু মডারেট পন্থীরা তা মেনে নিলেন না।

তারপর শুরু হলো বাকযুদ্ধ। এরপব চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হলো।

তাই দেখে সুরেন্দ্রনাথ অরবিন্দের প্রতি কটু কথা বলে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

পরে পুলিশী হস্তক্ষেপে সভা ভেঙ্গে যায়। সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন বানচাল হয়ে গেলে জনসাধারণের মনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দিন দিন কমতে লাগলো। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়তে থাকলো।

সুরাট কংগ্রেস অরবিন্দের মতামত অগ্রাহ্য করলেও অরবিন্দ বুঝলেন একদিন না একদিন কংগ্রেস তাঁর মত স্বীকার করবে। আজ কংগ্রেস ভেঙ্গেছে বলে দুঃখ করবার কিছু নেই। কংগ্রেস আবার জেগে উঠবে নবশক্তি নিয়ে।

সুতরাং সুরাট কংগ্রেসের পতন ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। ভারতের ভাগ্যাকাশে আগামী দিনের শুভ সূর্য্যের উদয় হবে।

সুরাটে দক্ষ যজ্ঞের পর বাংলায় বিপ্লববাদের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করলো। তিনি বোম্বাইতে অবস্থান কালে খবর পেলেন, মেদিনীপুরের কাছাকাছি নারায়ণগঞ্জে ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেণ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। কুষ্টিয়াতে এক মিশনারী পাদরী খুন হয়েছে। সেইসঙ্গে বিপ্লবীরা কলকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোড-এর পদোন্নতিতে উদ্বেগ বোধ করেছে এবং তাকে মারবার পরিকল্পনা করছে। তিনি নাকি মজঃফরপুরে বদলি হয়ে গেছেন। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীগণ মজঃফরপুরে গিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছেন।

এইসব খবর শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। কারণ তিনি নিরস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা মেনে নিলেও ভেতর ভেতর তিনি সশস্ত্র বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। এই ব্যাপারে তিনি আইরিশকন্যা বিপ্লবী ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে এককালে অনুপ্রেরণা পান। তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমারও ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবীমনের অধিকারী হন।

বাংলায় বিপ্লববাদীদের সমর্থন জানিয়ে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' কাগজে লিখলেন : 'রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আর ক্ষত্রিয়ের নীতিবোধই আমাদেরকে রাজনৈতিক কাজে পরিচালিত করবে। ন্যায় ও বৈধতা রাজনৈতিক ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু তা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ও বৈধতা।

আক্রমণ অন্যায় হয় তখনই যখন তার কোন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকে না। বলপ্রয়োগ অবৈধ হয় তখনই যখন তা হয় স্বেচ্ছাচারী অথবা অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সে দার্শনিকতা বন্ধ্যা যা সকল কর্মকেই এক যন্ত্রবৎ নিয়মের অধীন করতে চায় অথবা একটি বুলি অবলম্বন করে সমগ্র মানবজীবনকে তার অনুগত করতে চেষ্টা করে…'

সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে গেলে অরবিন্দ বরোদা, বোম্বাই ও পুনায় যান এবং বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করেন।

বরোদায় থাকার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় গৃহী ও পরম যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার লেলের সঙ্গে সেজদাদার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। লেলে সাতদিন ধরে অরবিন্দকে একটি নির্জন ঘরে রেখে যোগধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি যখন বরোদায় ছিলেন সেই সময় ভগিনী নিবেদিতা, তাঁর সঙ্গে দেখা করে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'রাজযোগ'-গ্রন্থখানি উপহার দেন। অরবিন্দ ঐ গ্রন্থ হতে রাজযোগ-এর প্রেরণা পান এবং যোগ শিক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত যোগীগুরুর অন্বেষণ করতে থাকেন। এতদিনে তিনি মনোমত গুরুর দর্শন পেলেন।

এর আগে অরবিন্দের সঙ্গে একাধিক সন্ন্যাসী ও যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেকথা আগেই বলেছি।

তিনি বাংলার বাইরে থাকার সময় 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার জন্যে নিয়মিতভাবে লিখতেন এবং ডাকযোগে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন।

অরবিন্দ বোম্বাই প্রদেশের নানা জায়গায় ঘুরতেন তার কারণ হচ্ছে জনগণের মনে জাতীয়তার ভাব এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠেছে কিনা তা জানবার জন্যে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউশনের বিরাট সভায় ভারতের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

'ভারতবর্ষে বর্তমান স্বাজাতিকতা বা স্বাদেশিকতা নামে যে একটা ধর্ম আছে তা আপনারা পেয়েছেন বাংলা হতে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছেন আর সেই জন্যেই নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। এই ধর্ম গ্রহণ করার দায়িত্ব আপনারা উপলব্ধি করেছেন তো? না, কেবল উচ্চস্তরের বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ববোধেই আপনারা এ গ্রহণ করেছেন? আপনারা তো নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে অভিহিত করছেন। স্বাজাতিকতা বা ন্যাশনালিজম্ বলতে আপনারা কি বোঝেন? স্বাজাতিকতা একটা রাজনীতিক কার্যক্রম নয়। স্বাজাতিকতা একটা ধর্ম বিশ্বাস, যা আপনারা কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করতে পারেন না। যাঁরা জাতীয়তাবাদী, তাঁদেরকে আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই স্বাজাতিকতা-ধর্ম স্বীকার করে নিতে হবে। তাঁদেরকে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাঁরা ভগবানের হাতের যন্ত্র মাত্র। বাংলায় যা ঘটেছে তা কি? তাঁরা সকলেই তো জাতীয়তাবাদী। কিন্তু বাংলার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আপনারা কি করবেন? রাজ-নিগ্রহ যে বাংলায় দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ বাংলা দেশে জনগণের মধ্যে স্বাজাতিকতার আবির্ভাব হয়েছে একটা ধর্মরূপে এবং একে ধর্ম বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।......বাংলা দেশে কিসের বলে আমরা টিকে আছি? স্বাজাতিকতার বিনাশ হয়নি—হবেও না। ঐশী শক্তিতেই স্বাজাতিকতা টিকে থাকবে আর যত কিছু অস্ত্রই এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হোক না কেন এর বিনাশ কখনো সম্ভব হবে না। স্বাজাতিকতা অমর, স্বাজাতিকতার মৃত্যু হতে পারে না, কেননা এ কোন মানবীয় বস্তু নয়, বাংলা দেশে স্বয়ং ভগবান কাজ করছেন। ভগবানকে

নিধন করা যেতে পারে না—কারাগারে আবদ্ধও করা যেতে পারে না।...'

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী। বেরারের অমরাবতী শহরের এক জনসভায় 'বন্দে মাতরম্' গান ও তার রচয়িতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভাষণ দেন অরবিন্দ। তিনি বলেন, 'আমাদের 'বন্দে মাতরম্' গান ঠিক ইউরোপীয় জাতীয় সংগীতের মত নয়। এ হচ্ছে একটি পবিত্র মন্ত্র যা আমাদের উপহার দিয়েছেন আনন্দমঠের গ্রন্থকার যাঁকে প্রেরণাদায়ক ঋষি বলা যেতে পারে।...বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্ত্র তাঁর সমসাময়িক কালে আদৃত হয়নি। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এই বলে যে এককালে এই গানে সমগ্র ভারতবর্ষ জেগে উঠবে। তাঁর সেই ভবিষ্যৎবাণী ফলেছে।'...

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন অরবিন্দ।

কলকাতায় এসে তিনি কেবলমাত্র 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত রইলেন না। প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কলকাতার উপকণ্ঠে এবং নিকটবর্তী মফঃস্বল অঞ্চলে একাধিক বক্তৃতা দেন।

১০ই এপ্রিল তারিখে ডাঃ সুন্দরী মোহন দাসকে সভাপতি করে 'united congress' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন: 'সুরাটের কংগ্রেস যে সার্থক হয়নি বুঝতে হবে এ ভগবানেরই অভিপ্রেত আর এ যদি আবার ঐক্যের ভিত্তিতে মিশতে পারে, তাও হবে ভগবানের অভিপ্রায়েই। কিন্তু যদি আমাদের ঐক্য ও মিলনের প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং জাতীয়তাবাদী নবীন দলকে যদি নির্য্যাতন এবং দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় তাকেও ভগবানের অভিপ্রেত বলে মেনে নিতে হবে। নির্য্যাতন এবং দুঃখ এড়িয়ে আমরা আপোষের জন্যে আগ্রহান্বিত হবো না; কারণ দুঃখভোগ যদি ভগবানের অভিপ্রেত

হয়, সেই দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে যাতে দেশজননীর শৃঙ্খলভার উন্মোচিত হয়।’

এর দু’দিন পরে ১১ই এপ্রিল তারিখে অরবিন্দ বারুইপুরের এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন: ‘...বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে আমার দেশ যেমন আমিও তেমনি জাতীয়তাধর্ম হতে বিচ্যুত। এখন আমার দেশ যেমন তার স্বধর্মে ফিরে যেতে চাচ্ছে আমিও তেমনি, আমারা এখন নতুন করে জাতীয়তাভাবের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ... আমরা স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক জীবনের জন্যে নিজেদের যে অযোগ্য মনে করি এর একমাত্র কারণ আমরা তাকিয়ে আছি ইংলণ্ডের দিকে এবং তাকেই আমাদের পরিত্রাতা মনে করছি। বাঙ্গালীই সর্বপ্রথম বিদেশীর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেছে। বিদেশীকে আমরাই এনেছি আর তাদের শাসনকে আমরাই প্রতিষ্ঠিত করেছি। তখন আমরা অধঃপাতিত হয়েছিলুম—আমাদের পক্ষে বিদেশীর শাসন প্রয়োজন হয়েছিল আমাদের রক্ষা করতে, শিক্ষিত করতে এবং এমন কি আমাদের আহার্য্য যোগাতে। আমাদের আত্মনির্ভরতা এতখানি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে মানবজীবনের এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করতে পারিনি। এই মায়া দূর হতে পারে দুঃখভোগ ও নির্য্যাতনের পথে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ এই মায়া দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট।...ভগবান আমাদেরকে স্বাধীন করবেন—এই কথা আমরা যখন বলতে পারবো তখন পৃথিবীতে এমন কোন ক্ষমতা নেই যে আমাদিগকে পরশাসনের অধীনে রাখতে পারে। জাতীয় শিক্ষা, বয়কট, স্বদেশীয় প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এইখানেই। চলার পথে বাধা বিঘ্ন দেখে শঙ্কিত হয়ো না। যত বড় বাধাই তোমার সামনে থাকুক না কেন, তাতে কিছুই আসে যায় না। তোমরা স্বাধীন হও—এই-ই বিধাতার বিধান আর তোমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করবে।...ভগবানের শক্তি আমাদের ভেতর ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করবোই। সেই শক্তির কাজ ক্রমশই দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ

করছে। মনে করো না যে এ আমরা করছি, আমাদের চেয়েও শক্তিমান একজন নেপথ্য হতে আমাদেরকে এই কাজ করতে বাধ্য করছেন। সমস্ত প্রকারের অধীনতার অবসান ঘটাবার জন্যে এবং পৃথিবীর চোখে ভারতকে স্বাধীনভাবে দাঁড় করাবার জন্যেই এই কাজ সুরু হয়েছে।'...

অরবিন্দের বীর্যাপূর্ণ বাণীতে দেশের যুবসাধারণের মনে এলো অভূতপূর্ব জাগরণ তারা 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একত্র মিলিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এরপর অরবিন্দ মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ পল্লীসমিতির সভায় বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেন, '...ভারতে বিদেশী শাসন জাতির পক্ষে মঙ্গলকর নয় ...এর দ্বারা ভারতবাসীদের জীবনে উন্নতি না হয়ে অবনতি হবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত মরণের পথেও ঠেলতে পারে। একথা নতুন সূত্রে পাওয়া যায়নি বা এ তত্ত্ব নতুন আবিষ্কার নয়। এটা হচ্ছে নির্দ্ধারিত সত্য যা লেখা আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং যার বিষয় ইউরোপীয়রা তাদের ছাত্রদের শিখিয়ে থাকে।'...

•

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। এইসময় অরবিন্দের পেছনে গোয়েন্দারা সব সময় ঘুরঘুর করতো। তিনি 'যুগান্তর' ও 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখতেন তার শক্তি বৃটিশ শাসকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতে লাগলো।

অরবিন্দ বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশের গতিবিধি বুঝতে পেরে সাবধান হলেন। একদিন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ও সেবক অবিনাশচন্দ্রকে ডেকে বললেন, ওহে আর দেরী করে লাভ নেই। স্কট লেনের বাসা বদল করার আয়োজন করো।

অবিনাশচন্দ্র তখন চিন্তা করতে লাগলেন, তাইতো এখন কি করা যায়। এইতো কিছুদিন আগে পুলিশের নজর এড়ানোর জন্যে

অরবিন্দকে সুকু খানসামা লেন থেকে নিয়ে আসা হলো স্কট লেনে। এখন আবার কোথায় বাসা পাওয়া যায়?

অরবিন্দও অবিনাশের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ অবিনাশ যে প্রেসের মালিক সেখানে যুগান্তর ছাপা হতো। তখন বিপ্লবীদের দু'জায়গায় আড্ডাখানা ছিল। প্রথম জায়গা হচ্ছে যুগান্তর বোর্ডিং, দ্বিতীয় জায়গা 'মানিকতলার বাগান' এই দুই জায়গায় বিপ্লবীরা যাতায়াত করতো অবিনাশের সঙ্গে বারীন্দ্রের প্রায়ই দেখা হতো।

অরবিন্দের কাছে অবিনাশ থাকতেন। তাঁর পরিচর্য্যার ভার নিয়েছিলেন। তাই অরবিন্দ স্থির করলেন অবিনাশকে 'যুগান্তর'-এর আওতা হতে কিছুদিনের জন্যে যদি দূরে রাখা যায় তাহলে তিনি পুলিশের নজর এড়িয়ে সুখে বাস করতে পারবেন। সেই সঙ্গে অরবিন্দের জীবনও নির্বিঘ্ন হবে

অবিনাশ ও অরবিন্দ দু'জন ভবিষ্যৎ নিরাপদ স্থানের অন্বেষণ করতে লাগলেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই নিরাপদ স্থানের সন্ধানও পাওয়া গেল।

অরবিন্দ জানতে পারলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় জাতীয় দলের মুখপত্র 'নবশক্তি'র অবস্থা সঙ্গীন। তার পরিচালনার দায়িত্ব কেউ যদি না নেয় তাহলে কাগজটি উঠে যাবে।

অরবিন্দ দেখলেন, এইতো মহাসুযোগ। এর পেছনে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে।

তিনি তখুনি মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে পত্র মারফৎ জানালেন, আপনার 'নবশক্তি'র ভার অবিনাশকে দিন এবং আমি তাকে 'যুগান্তর' হতে ছাড়িয়ে আপনার 'নবশক্তি পরিচালনার দায়িত্ব দেবো। সেই সঙ্গে আমরা দু'জনে 'নবশক্তি' অফিসে বসবাস করবো।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এই প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হলেন।

অবিনাশচন্দ্র 'যুগান্তর' পরিচালনার ভার অন্য একজনের হাতে দিলেন। তার নাম তারানাথ রায়।

এরপর অবিনাশচন্দ্র অরবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটে অবস্থিত 'নবশক্তি' কার্য্যালয়ে উঠে আসেন। ওখানে অরবিন্দ তাঁর স্ত্রী ও ভগ্নীকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

ওদিকে বাংলায় বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ গোপনে এগিয়ে চললো। বিপ্লবীরা রাইফেল আর বোমা সংগ্রহ করতে লাগলেন।

একদিন তাঁরা ঠিক করলেন, মজঃফরপুরের জেলা শাসক কিংস-ফোর্ডকে হত্যা করবেন।

এ কাজে প্রথম নাম ঠিক করা হলো যাঁর তিনি হলেন নরেন গোঁসাই। তিনি ছিলেন ধনীর সন্তান স্বভাবে সামান্য ভীতু। তাই ওকাজে এগিয়ে যেতে সাহসী হলেন না।

তখন বিপ্লবী উপেন্দ্র-বারীন্দ্র-উল্লাসকর গোষ্ঠী ঠিক করলেন, এ কাজে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীকে পাঠানো হোক।

ক্ষুদিরামের বয়স মাত্র ১৮ বছর প্রফুল্ল চাকীরও কম বয়েস। ঐ বিপ্লবী কিশোরদের হাতে রিভলভার ও বোমা তুলে দওয়া হলো। সেইসঙ্গে তাঁদের বলা হলো, বোমার আঘাতে অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করবেন আর আত্মরক্ষার জন্যে রিভলভার ব্যবহার করবেন। আর যদি আত্মরক্ষার কাজে ব্যর্থ হন তাহলে রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করতে যেন পিছ্-পা না হন।

বিপ্লবী কিশোর দু'জন কলকাতা হতে যাত্রা করলেন। ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় তাঁরা কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন। বোমা আসল মানুষের গাড়ীতে না লেগে লাগলো দু'জন ইংরাজ মহিলার গাড়ীতে। তাঁরা সামান্য আহত হলেন।

এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। পরে ইংরাজ পুলিশের দৃষ্টি বিপ্লবীদের সমস্ত ঘাঁটির ওপর এসে পড়লো।

ওদিকে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হলেন আর প্রফুল্ল চাকী রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন।

মজঃফরপুরের ঘটনার সংবাদ টেলিগ্রামযোগে কলকাতায় 'বন্দে মাতরম্' অফিসে এসে পৌঁছলো।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ঐ টেলিগ্রাম নিয়ে অরবিন্দকে দেখালেন।

অরবিন্দ তখন অবিনাশকে বারীন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে তাকে সাবধান হতে বললেন। সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন যেন বিপ্লবীদের অন্যান্য নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অরবিন্দের কথামত বারীন্দ্র বহু বিপ্লবীকে সতর্ক করে দিলেন। অনেকে নিজের বাড়ীতে চলে গেল।

উল্লাসকর কয়েক বাক্স বোমা নিয়ে হ্যারিসন রোডের একটি মেসে এসে উঠলেন।

হেমচন্দ্র দাস কানাই দত্তকে সঙ্গে নিয়ে মানিকতলার বাগান থেকে (১৫২ গোপীমোহন দত্ত লেন) নিজের বাসায় এলেন।

মানিকতলার বাগানের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈরীর যন্ত্রপাতি মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হলো। সেই সঙ্গে বিপ্লবীরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন, তাঁরা পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করবেন না তাঁদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করবেন। তাঁদের অন্তর আশঙ্কায় দুরু দুরু করতে লাগলো।

১লা মে, রাত ১২টা। পুলিশ সমস্ত সন্দেহজনক জায়গাগুলি ঘিরে ফেললো।

৩২নং মুরারীপুকুর রোডে মানিকতলা বাগানটি ভাল করে ঘিরে ফেললো।

তখন বেশ রাত্রি। চারিদিক অন্ধকার থম্‌থম্ করছে। এর মধ্যে কয়েকজন বিপ্লবীকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো।

বারীন্দ্র বললেন, পুলিশ যদি আমাদের ধরতে পারে তাহলে আমি

উল্লাস, উপেন সমস্ত দায়িত্ব নেবো। সেই সঙ্গে বলবো, অন্য সকলে নির্দোষ। তারা ষড়যন্ত্রের কথা জানে না।

কিন্তু বারীন্দ্রের সব জল্পনা-কল্পনাই সাব হলো। রাত চারটের মধ্যে পুলিশ প্রায় সকল বিপ্লবীদের ধরে ফেললো। সেই সঙ্গে তারা মাটির তলা থেকে লুকনো অস্ত্র-শস্ত্রও উদ্ধার করলো।

সেদিন রাতে মোট ৩০ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলেন। হেমচন্দ্রকে তাঁর বাসা হতে এবং উল্লাসকরকে এবং আরও কয়েকজনকে হ্যারিসন রোড হতে গ্রেপ্তার করা হলো। সেই সঙ্গে পুলিশ হ্যারিসন রোড থেকে চার বাক্স বোমাও উদ্ধার করলো।

এবার পুলিশের নজর পড়লো গ্রে ষ্ট্রীটের ওপর। পুলিশ সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান ইনস্পেক্টর বিনোদ গুপ্তকে নিয়ে অরবিন্দ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর সহকারী শৈলেন্দ্রনাথ বসুকে গ্রেপ্তার করলো।

'নবশক্তি' কার্য্যালয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও পুলিশ কিছু পেল না। এরপর পুলিশ 'যুগান্তর পুস্তকালয়' ও 'ছাত্র-ভাণ্ডার'-এ তল্লাসী চালিয়ে কতকগুলি কাগজ উদ্ধার করে।

এরপর গ্রেপ্তার হলেন দেবব্রত বসু এবং নরেন গোঁসাই।

অরবিন্দের হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধা দেখে অনেকে পুলিশকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

মোট ৪৭ জন বিপ্লবী ধরা পড়লেন। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন।

পরে বন্দীদের নিয়ে আসা হলো লালবাজারে। পুলিশ কমিশনার তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে তাঁদেরকে পাঠিয়ে দিলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির কোর্টে তাঁদের বিচারের ব্যবস্থা হলো।

বারীন ঘোষ ইংলণ্ডে জন্মেছেন বলে তাঁর বিচার হাইকোর্টে হবার কথা হলো। বারীন্দ্রকুমার তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

হ্যারিসন রোড বোমার মামলার প্রধান আসামী ছিলেন উল্লাসকর দত্ত। তাঁর বিচার হাইকোর্টে ও আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে চলতে লাগলো।

নির্দিষ্ট দিনে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা শুরু হলো। সকল আসামী একে একে জবানবন্দী দিলেন। অরবিন্দ বললেন, 'স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইনবিরুদ্ধ হয় তাহলে আমি দোষী—একথা স্বীকার করি। আমি যা করেছি তা অস্বীকার করবো কেন? এরই জন্যে আমি জীবন ধারণ করেছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। এই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় তাহলে আর সাক্ষী সাবুদের প্রয়োজন কি? আমি এখানে উপস্থিত এবং এ অভিযোগ আমি স্বীকার করছি। পাশ্চাত্যের তত্ত্বগুলি আমি গ্রহণ করেছি আর তাদের সঙ্গে বেদান্তের অনবদ্য শিক্ষার সমন্বয় করেছি। এই আদর্শই আমি আমার প্রত্যেকটি রচনায় প্রকাশ করেছি। আমি মনে করি, আমাদের কাজ হচ্ছে দেশবাসীকে বলা, তাদেরকে উপলব্ধি করানো যে পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট দান আছে, ভারতের একটি মিশন আছে, সমস্ত মানবজাতির জন্যে তা করতে হবে। এই যদি আমার অপরাধ হয় তাহলে আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে আমাকে প্রদান করুন। আপনারা আমায় কারারুদ্ধ করতে পারেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারেন কিন্তু আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই অস্বীকার করবো না। আমি অকুণ্ঠ ভাবেই বলতে চাই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়

বারীন্দ্রকুমার তাঁর জবানবন্দীতে বললেন, 'আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন দত্তকে নিয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকা বের করেছিলুম। এঁরা আমার বিপ্লবপ্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। আমিই উল্লাসকর ও উপেন্দ্রকে নিয়ে বিপ্লবকার্য্য আরম্ভ করেছি।

ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আসামীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোঁসাইও আমাদের সঙ্গে ছিল। দেশের লোককে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে শিক্ষা আমরা দিয়েছি।...কেন এইসব কথা আমি স্বীকার করছি? আমাদের দলের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেছিল যে তাঁরা সব কথাই অস্বীকার করবেন। কিন্তু আমি এঁদের মত ফিরিয়েছি।...সকলকে লিখিত জবানবন্দী দিতে বলেছি। আমার ধারণা এই যে, আয়োজন যখন প্রকাশ হয়েছে তখন আর এর দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতার সম্পর্কে আর ফল লাভের আশা নেই। আমাদের মধ্যে যারা নির্দোষ তাদেরকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর সেজন্য, প্রকৃত আসামীকে অগ্রবর্তী করে দেওয়া দরকার।'

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জবানবন্দীতে বললেন, 'ইংরাজ সরকারের উচ্ছেদসাধন করবার জন্যে আমিই বিপ্লবী দলে নেতৃত্ব করতুম। যতক্ষণ কলকাতায় থাকি, আমি ছেলেদের অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে থাকি। আমিই তাদেরকে আমাদের দেশের অবস্থা ও স্বাধীনতালাভের আবশ্যকতা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি ...শিক্ষা দিই যে আমাদিগকে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। দেশময় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে আমাদের মত প্রচার করতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে আর ঠিক সময় উপস্থিত হলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে।...আমি এসব কথা এজন্য স্বীকার করলুম যে নির্দোষ লোক যেন শাস্তি না পায়।... আরও বললুম এইজন্যে যে যারা একাজ চালাবে তারা যেন অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে পারে।'

উল্লাসকর দত্ত তাঁর জবানবন্দীতে বললেন, 'ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদসাধন আমার জীবনের ব্রত। এই মহাকার্য্য সম্পাদনের জন্যে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে বোমা তৈরী করেছি।...বারীনদা, আমি, উপেনদা, ইন্দু, প্রফুল্ল, বিভূতি এরাই প্রকৃত কার্য্যকারক।

আমার এই সব স্বীকারোক্তি করার উদ্দেশ্য এই যে নির্দোষ ব্যক্তি যেন দণ্ডিত না হয়।'

আদালতে বিপ্লবীদের এই প্রকার নির্ভীক স্বীকারোক্তি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন বিচারক।

বিপ্লবীদের মনে এমন তেজ ও সাহস এসেছিল অরবিন্দের আদর্শ হতে।

এই সময় আর এক অঘটন ঘটলো। ইংরাজ পুলিশ মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলকের ওপর শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

অরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীগণ গ্রেপ্তার হয়েছেন জেনে তিলক তাঁর পত্রিকা 'কেশরী'তে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৮ সালের ১২ই মে তারিখের সংখ্যায় লিখলেন 'The country's misfortune' (দেশের দুর্ভাগ্য) আর ৯ই জুন তারিখে লিখলেন 'The Remedies are not lasting' (এই সকল প্রতিকার স্থায়ী নয়)।

ঐ দু'টি প্রবন্ধে তিলক লিখলেন, বৈদেশিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি বরদাস্ত করা হবে না। বৃটিশ সরকার নিরঙ্কুশ দমননীতির দ্বারা ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীক চেতনাকে খর্ব করতে পারবেন না।

প্রবন্ধ দুটি পাঠ করার পর বৃটিশ সরকার তিলকের প্রতি রুষ্ট হলেন এবং তাঁকে দু'বছরের জন্যে নির্বাসনদণ্ড দেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট। এই দিনটি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এক অগ্নিক্ষরা দিন। এই দিনে ফাঁসি হলো ক্ষুদিরাম বসুর।

জেলে বসে অরবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীরা এই খবর শুনতে পান।

এই সময় বাংলাদেশ প্রায় নেতাশূন্য হয়ে পড়লো। বিপ্লবীরা কাকে নিয়ে বা কার নির্দেশে কাজ চালিয়ে যাবে সেই কথা চিন্তা

করতে লাগলেন। কারণ তাঁরা দেখলেন, অরবিন্দের মত নেতা জেলে, বিপিনচন্দ্র পাল বিলেতে এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মৃত। এমন অবস্থায় তাঁরা শেষকালে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে নেতা মনোনীত করলেন।

শ্যামসুন্দরের ওপর গুরু দায়িত্বভার এসে পড়লো। তিনি একা 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনা, আলিপুর বোমার মামলার তদ্বির এবং বিপ্লবীদের দেখাশোনা সবকিছু করতে লাগলেন।

অনেকে ভয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে কথা বলতো না। যে সকল বিপ্লবী তরুণ জেলের বাইরে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কথা-বার্তা হতো না।

এই কৃষ্ণকুমার মিত্র অরবিন্দ ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি 'অরবিন্দ ডিফেন্স্ ফণ্ড' খুললেন এবং তাতে জমা পড়লো ৭০ হাজার টাকা। এই টাকা ধৃত বিপ্লবীদের মামলার জন্য খরচ করার ব্যবস্থা হলো।

কৃষ্ণকুমার মিত্র তখনকার দিনের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে দিনে একহাজার টাকা ফি দিয়ে অরবিন্দের পক্ষে ওকালতি করবার জন্যে নিযুক্ত করলেন। এছাড়া অনেক তরুণ উকিল ও ব্যারিস্টার তরুণ বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন।

আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা চলতে লাগলো। একুশ দিন মামলা চলার পর ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর পেছনে একুশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল।

বিপ্লবীরা দেখলেন, ফণ্ডে আর বেশী টাকা নেই। সুতরাং তাঁরা ব্যোমকেশকে আর ধরে রাখতে পারলেন না।

ব্যোমকেশ চলে গেলেন। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী হলেন না।

তার বদলে তখনকারদিনে তরুণ ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এগিয়ে এলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে অরবিন্দের পক্ষ

সমর্থন করে মামলা চালাতে রাজী হলেন। তবে তখন তার অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না বলে এবং আইনের পুঁথিপুস্তক কিনতে হবে বলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিলেন বিপ্লবীদের কাছ থেকে।

তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেক উকিল-ব্যারিস্টার অন্যান্য বিপ্লবীদের পক্ষে বিনা ফিতে মামলা চালাবার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁরা হলেন রজত রায়, বি. সি. চ্যাটার্জি. নরেন্দ্রকুমার বসু, বিজয় কৃষ্ণ বসু. শরৎচন্দ্র সেন (দেশবন্ধুর ভগ্নীপতি), পি. মিত্র এবং আনন্দমোহন রায় প্রধান।

তিন মাস মামলা চলার পর দায়রা আদালতে স্থানান্তরিত করা হলো। সরকার পক্ষ বেশ জোরালো ভাবে মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। বিচারপতি হলেন লণ্ডনে অরবিন্দের সহপাঠী এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মিঃ বীচক্রফট্। সরকার পক্ষে ব্যারিস্টার দাঁড়ালেন মিঃ নর্টন, মিঃ বার্টন ও মিঃ উডরফ। তাঁদের সহকারী হলেন সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। সরকার পক্ষ হয়ে মামলার তদ্বির করতে লাগলেন পুলিশের সি. আই. ডি ইনসপেক্টর মৌলবী সামসুল আলাম

দিনের পর দিন আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সকলের মুখে ঐ এক মন্ত্র—'বন্দে মাতরম্'।

এক বছর চার দিন বিচারের পর এই মামলার প্রথমবারের মত যবনিকা পড়লো। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু অঘটন ঘটে গেল। রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে বিপ্লবী কানাই ও সত্যেনের হাতে নিহত হলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো ছোট লাট এণ্ড্রু ফেজারকে হত্যার চেষ্টা। ১৯০৮ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে কলকাতায় ওভারটুন হলে এক জনসভায় এসেছিলেন ফেজার। সেই সময় আড়বালিয়ার বিপ্লবী যুবক জিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ফেজারকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন।

দুঃখের বিষয় তাঁর রিভলভারটি খারাপ ছিল বলে সে যাত্রায় ফেজার বেঁচে গেলেন।

তৃতীয় ঘটনা হলো পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যা। ইনি মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের অন্যতম শহীদ প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ রাজসরকারের বিশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে আর বেশী দিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলো না। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর রাতের বেলায় বিপ্লবীদের পিস্তলের গুলিতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হলো।

চতুর্থ ঘটনা হলো কয়েকজন জননেতার নির্বাসন। ইংরাজ পুলিশরা ভাবলো এই সকল জননেতারা বিপ্লবীদের পেছনে থেকে বিপ্লবের কাজে উস্কানি দিচ্ছে। সুতরাং এঁদের আগে জেলে পোড়া উচিত। তাই ১৮১৮ সালের রেগুলেশন আইনের বলে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ন'জন দেশনেতাকে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হলো। সেই ন'জন নেতাদের মধ্যে ছিলেন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার তৎকালীন প্রবীন সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, দেশমান্য অশ্বিনীকুমার দত্ত, 'নবশক্তি' পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাস, শচীন্দ্রনাথ বসু (কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহকারী), রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বরিশাল কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভূপেশচন্দ্র নাগ (পুলিন দাসের সহকারী)।

পঞ্চম ঘটনা হলো সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর দায়রা আদালতের সামনে চারুচন্দ্র বসুর রিভলভারের গুলিতে আশুতোষ বিশ্বাস প্রাণ হারান।

আলিপুরে বিচারক বীচক্রফটের আদালতে মামলা চলতে লাগলো। সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন আসামী পক্ষের প্রধান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসকে নানাপ্রকার যুক্তি তর্কে পরাজিত

করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাসের অপূর্ব আইন প্রতিভা অরবিন্দকে নানাভাবে রক্ষা করতে লাগলো। সরকার পক্ষ থেকে যখনি অরবিন্দকে নানা কারণে দোষী সাব্যস্ত করার কৌশল উদ্‌ঘাটিত হতে লাগলো চিত্তরঞ্জন দাসের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সওয়াল কৌশল সেগুলি নস্যাৎ করে দিলো। তিনি এও বললেন, এই পণ্ডিত ও ধীশক্তি সম্পন্ন শান্ত মানুষটির মনে স্বাধীনতাস্পৃহা আজন্ম লালিত থাকলেও ইনি কখনো বোমা ও রিভলভার নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করতে পারেন না। তাছাড়া এঁর বাসা ছিল গ্রে স্ট্রীটে 'নবশক্তি' পত্রিকার অফিসে। সুতরাং এঁর সঙ্গে 'যুগান্তর' দলের যোগাযোগ কিছুতেই থাকতে পারে না।

চিত্তরঞ্জনের এই যুক্তি জালে মুগ্ধ হলেন বিচারপতি। সরকার পক্ষের ব্যারিস্টারও ঐ যুক্তির ওপর আর কোন মন্তব্য করতে নারাজ হলেন।

শেষকালে অরবিন্দ নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি পেলেন। তাঁর সঙ্গে দেবব্রত বসু, নিখিলেশ্বর, হেমেন্দ্র, শচীন্দ্র, নরেন্দ্র বক্সী, নলিনী গুপ্ত; বিজয় নাগ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্র, পূর্ণ সেন, বারীন্দ্র ঘোষ, প্রভাস দে, দীনদয়াল, বিজয় ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জ সাহা ও হেম সেন এই ১৭ জন মুক্তি লাভ করলেন। বাকী ১৯ জনের মধ্যে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম হলো। উপেন্দ্র, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, সুধীর, ইন্দু, অবিনাশ, শৈলেন ও হেমচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ হলো। নিরাপদ, শিশির ও পরেশ দশ বছরের জন্যে দ্বীপান্তর-দণ্ড পান। সুশীল ও বালকৃষ্ণ পান সাত বছরের জন্যে দ্বীপান্তর-দণ্ড। কৃষ্ণজীবন পেলেন এক বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড আর একজন আসামী বিচার শেষ হবার আগেই মারা যান।

মিঃ বীচক্রফ্‌টের রায় বেরুলো। ব্যারিস্টার সি. আর. দাস এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল করলেন। ১৯০৯ সালের নভেম্বর

মাসে হাইকোর্টের রায় বেরুলো। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির দণ্ড রহিত হলো। তাঁরা ভোগ করবেন যাবজ্জীবন দীপান্তর-দণ্ড।

আসামীপক্ষের সওয়াল শেষ করে উপসংহারে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস আবেগময় ভাষায় বিচারপতি বীচক্রফটকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি আপনার সামনে এইটুকু নিবেদন করছি যে এর পরে যখন বাদানুবাদ থেমে যাবে, যখন এই সব আন্দোলন আর হুলুস্থুল স্তব্ধ হয়ে যাবে—এই শ্রীঅরবিন্দও যখন দেহত্যাগ করে পরলোকে চলে যাবেন, তারও পরে জগতের লোক বলবে যে, ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের অমর কবি, ইনি ছিলেন জাতীয়তার অগ্রদূত আর মানব জাতির নিঃস্বার্থ প্রেমিক। ইনি যখন এ জগতে থাকবেন না তখনও এঁর বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয়, এ দেশ ছাড়িয়েও দূর-দূরান্তরে সাগরপারে দেশবিদেশে উদগ্রভাবে অনুরণিত হতে থাকবে।'…

সেদিন সত্যদ্রষ্টা ও কবি চিত্তরঞ্জন দাসের কথা পরবর্তী কালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠলো। আজ মহাযোগী অরবিন্দের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁর প্রতি ভক্তিনম্র ভাব ও শ্রদ্ধায় বিশ্ববাসীরা মাথা নত করে।

কারাবাসকালে অরবিন্দ যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন 'কারাকাহিনী' নামক পুস্তকে। তিনি বাংলাভাষায় এই গ্রন্থ লেখেন। এতে তাঁর রসিক মনের নিদর্শন অতি উত্তমরূপে ধরা পড়েছে ঃ 'আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজসরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ অতিথিসংকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটি উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্ব স্বরূপ থালা বাটির এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে,

একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত; তখন এক হাতে আহার করা, আর এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুখান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটাই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিস ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্বকার্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে,—জজ, শাসনকর্ত্তা, পুলিশ, শুল্ক বিভাগের কর্তা, মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবা মাত্র হইতে পারে,—যেমন তাহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগ কর্তা, পুলিশ বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্‌শিলারও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতি সাম্মলন হওয়া সুখসাধ্য;—আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারি দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগ সাধনের উপায়-স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইবে? নির্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্ত্তৃপক্ষ শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাস কালে এতদ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষা লাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত।'

১৯০৯ সালের ৬ই মে। জেল থেকে বেরিয়ে এলেন অরবিন্দ। বাইরে এসে দেখলেন বাংলার অবস্থা শান্ত। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে গেছেন নির্বাসনে, অনেকে ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেছেন, অনেকে হাজতবাস করছেন, অনেকে আবার চলে গেছেন সুদূর ইংলণ্ডে। যাঁরা বাইরে আছেন তাঁরা আত্মগোপন করে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করেন। সর্বদা সতর্ক থাকেন কখন পুলিশের দৃষ্টি এসে পড়বে তাঁদের ওপর।

মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ কলেজ স্কোয়ারে 'সঞ্জীবনী' অফিসে এলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র তখন নিবাসন দণ্ড ভোগ করছেন তাঁর পুত্র সুকুমার মিত্র অরবিন্দ, তাঁর স্ত্রী ও ভগ্নীর দেখাশোনার ভার নিলেন।

অরবিন্দের সঙ্গে জেলের ওয়ার্ডার ধরম সিং ও এলো। সে জেলে থাকার সময় অরবিন্দকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় অরবিন্দের নির্বাসনকালে সে দীর্ঘ এক বছর তাঁর সেবা করে এসেছে। অরবিন্দ যখন মুক্তি পেলেন তখন ধরম সিংও তাঁর সঙ্গে এলো 'সঞ্জীবনী'র অফিসে।

আগেই লিখেছি, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর অরবিন্দ মনোমত সঙ্গী পেলেন না। অন্তরঙ্গ কর্মীরা সকলেই জেলে বা নির্বাসনে রয়েছেন। বিপিনচন্দ্র পাল লণ্ডনে গিয়ে ইংরাজীতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। মডারেটপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে বিপ্লব থামাবার জন্যে নতুন শাসনসংস্কার দাবী করছেন। জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্রগুলি—'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর', 'নবশক্তি' ও 'বন্দে মাতরম্' এর অস্তিত্ব নেই।

এর ওপর চারদিকে কেমন যেন এক সন্ত্রাসের ভাব বিদ্যমান দেখা গেল। এই অবস্থায় অরবিন্দ কিছুতেই স্থির করতে পারলেন না তাঁর আগামী দিনের কর্মপন্থা কি হবে।

এই প্রকার চিন্তা করছেন অরবিন্দ এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গিরিজাশঙ্করের।

গিরিজাশঙ্কর হচ্ছেন 'বন্দে মাতরম্‌-'এর পূর্বেকার কর্মকর্তা শ্যামসুন্দরের ছোট ভাই।

গিরিজাশঙ্কর বললেন, আমি একটি ইংরাজী ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। আপনি যদি এর সম্পাদনার কাজ নেন তাহলে ভাল হয়। এর নামকরণও করবেন আপনি।

অরবিন্দ সম্মতি দিলেন। সেই সঙ্গে বললেন, নতুন পত্রিকার নাম রাখুন কর্মযোগিন।

মাত্র ষোল টাকা মূলধন সম্বল করে গিরিজাশঙ্কর কাগজ বের করার কাজে নামলেন।

এই সময় অরবিন্দ উত্তরপাড়ার 'ধর্ম রক্ষিনী' সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তার কিছু অংশ বাংলায় উদ্ধৃত করছি: '...দ্বাদশ মাস যে আমি জেলের মধ্যে ছিলুম সেই সময় দিনের পর দিন তিনি শ্রীভগবান আমাকে সেই জ্ঞানই দিয়েছেন, আর এখন যে আমি বেরিয়ে এসেছি এখন সেই জ্ঞানই আপনাদের কাছে প্রকাশ করবার জন্যে আমাকে আদেশ করেছেন। নির্জন সেলের মধ্যে আমি দিবারাত্র অপেক্ষা করতে লাগলুম, আমার ভেতরে ভগবানের বাণী শোনবার জন্যে, তিনি আমাকে কি বলতে চান তা জানবার জন্যে, আমাকে কি করতে হবে তা বোঝবার জন্য। এই নির্জনবাসেই এলো আমার সর্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা। তিনি আমাকে বললেন যে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি। কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয় এবং কখনও আমার অভিপ্রায় ছিল না যে তুমি এই কাজ নিয়ে থাকবে। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যে তোমাকে এখানে এনেছি। তুমি নিজে যা শিখতে পারনি তাই তোমাকে শিখিয়ে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজের জন্যে তৈরী করে তুলতে। তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে

সক্ষম হলুম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়নি পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্খা করে, তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান— রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্খা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম করতে হবে; নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে: উচ্চ-নীচ শত্রু-মিত্র, জয়-পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না। আমি অনুভব করলুম, হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম কি? আমরা অনেক সময়েই হিন্দুধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা বলি, কিন্তু সে ধর্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে ক'জন জানে? অন্যান্য ধর্মের কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ কিন্তু সনাতনধর্ম হচ্ছে জীবনই; এটি এমন জিনিস যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার মানবজাতির মুক্তির জন্য এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে অন্যান্য দেশের মত সে নিজের জন্যে উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্ব্বলকে পদদলিত করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকিরণ করবার জন্যে সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্যে জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্যে নয়, আর তাকে যে বড় হতে হবে তাও তার নিজের জন্যে নয়, মানবজাতির জন্যে।...

'জেল আমাকে যে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালুম, কিন্তু দেখলুম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়াতলে আমি বেড়াতুম, কিন্তু আমি যা দেখলুম তা বৃক্ষ নয়, জানলুম তা বাসুদেব, দেখলুম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান, এবং আমার ওপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন।

আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলুম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলুম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার বিছানাস্বরূপ যে একটি কম্বল দেওয়া হয়েছিল তার ওপরে শুয়ে উপলব্ধি করলুম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহুদ্বয় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে—সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের।'..

১৪নং শ্যামবাজার স্ট্রীট। এখানে একটি বাড়ী ভাড়া নিলেন গিরিজাশঙ্কর। স্থাপন করলেন শ্রীনারায়ণ প্রেস। এখান থেকেই ১৯০৯ সালের ১৯শে জুন 'কর্মযোগিন' প্রকাশিত হলো।

পত্রিকার প্রচ্ছদ পটে শোভা পেল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রথী ও সারথি—অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ।

ছবির নীচে গীতার অমর বাণী জ্বলজ্বল করতে লাগলো—'তস্মাৎ যোগায় যুধ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী নিয়ে 'কর্মযোগিন' তার যাত্রা সুরু করলো।

পত্রিকার কর্মকর্তা হলেন গিরিজাশঙ্কর। সংবাদ সরবরাহ করতে লাগলেন বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। রামচন্দ্র মজুমদার, সুরেশ চক্রবর্তী, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ প্রভৃতি যুবকেরা প্রুফ দেখার কাজে নিযুক্ত হলো। মুদ্রাকর হলেন মনোমোহন ঘোষ।

'কর্মযোগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ যেসব প্রবন্ধ লিখলেন তা হলো অধ্যাত্মবাদের আদর্শে কর্মের নবরূপায়ণ। গীতোক্ত কর্মযোগের অভ্যাস না করলে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না আর স্বাধীনতা এলেও তাকে রক্ষা করা যাবে না। একটি প্রবন্ধে লিখলেন, '...ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজকে গঠিত করলে আমাদের সমাজের ক্লেদ দূর হবে না। সমাজহিতৈষীদের এই অনুকরণ স্পৃহা, যন্ত্রচালিতের মত এই প্রাণহীন প্রচেষ্টা এবং দোষগুণ যাই থাকুক না কেন, এতে জাতির আত্মচেতনা মুক্তি পায় না, তার

অধঃপতনও রোধ করতে পারে না। এ হলো সেই আত্মিকশক্তি কারণ এই শক্তি দ্বারাই আমরা অন্তরে মুক্ত উদার হয়ে রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতা ও মহত্বলাভ করতে পারি '..

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস হচ্ছে তার অমর মহাকাব্য মহাভারত আর রামায়ণ, ইউরোপীয় সাহিত্য বা কাব্য নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির এই উৎস প্রসঙ্গে লিখলেন অরবিন্দ: 'রামায়ণে, মহাভারতে, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে, কাব্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যের মধ্যে যে ভারতকে আমরা পাই, ভারতের যে বিরাট আত্মিক শক্তির পরিচয় আমরা পাই—তার রহস্য কি? জ্ঞানে বিজ্ঞানে গরীয়সী ভারত তার সমাজ জীবনের যে অপূর্ব সৌধ গড়ে তুলেছিল তার ভিত্তিই বা কি? ক্ষত্রিয়, শিখ আর রাজপুতের অনন্য সাধারণ বীরত্ব ও ত্যাগের ভেতর দিয়ে ভারতের যে অপরাজেয় জীবনীশক্তি অভিব্যক্ত হয়েছিল, তার পেছনে কি ছিল? এই যে সর্বাঙ্গীন নিখুঁত বিরাট সভ্যতা, এর পেছনেই বা কি ছিল? এসব কিছুই সম্ভব হতো না যদি না আত্মার ও মনের শিক্ষায় ভারত সম্পূর্ণতা লাভ করে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পথে চলতো '

এভাবে অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' পত্রিকার মারফৎ ভারতবাসীদের কাছে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল ধারা তুলে ধরলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় ছিল রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ আর কর্মযোগিনে আধ্যাত্মিক চেতনা এই দুই বস্তু বাহ্যতঃ পৃথক বলে প্রতিভাত হলেও মূলে কিন্তু এক। ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মের স্থান চিরকাল ছিল এবং আজও আছে তাই ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি ভারতের ওপর দিয়ে নানা সময়ে নানা রকম বিদেশী রাজার আক্রমণ চলেছে, ভারত বার বার তার স্বাধীনতা হারিয়েছে কিন্তু হারায়নি তার একান্ত আপনার জিনিস সেই সুপ্রাচীন জাতীয় ভাবধারা। এর একমাত্র কারণ হলো ভারতবাসীরা আশ্রয় করে আছে ধর্মকে যা নাকি আসে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ

কোন সংস্কারের কথা চিন্তা করবে।……স্বরাজের স্বর্গ আমাদের অন্তরে। ভারতের গৌরবে এবং এর ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস রেখে এবং আমাদের অন্তরে ও জাতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে কর্মে এবং চিন্তায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই স্বরাজের স্বর্গ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে এবং এ রক্ষা করতে হবে।'

'কর্মযোগিন' প্রকাশিত হবার ৩।৪ দিন পরে বরিশালের ঝালকাটিতে এলেন অরবিন্দ। এখানে ২৩শে জুন তারিখের এক জনসভায় বক্তৃতা দেন তিনি। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা বক্তৃতায় তিনি ইংরাজ শাসকদের দমননীতির সমালোচনা করলেন।

ঝালকাটিতে বক্তৃতা দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন অরবিন্দ। এখানে আসার পর গভীর মনোযোগের সঙ্গে 'কর্মযোগিন' পত্রিকা সম্পাদনের কাজে লেগে গেলেন। ঐ পত্রিকায় তাঁর লেখা ' বন্ধ পাঠ করে জনসাধারণ বেশ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। দিনের পর দিন পত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে লাগলো

কেবল রাজনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো না 'কর্মযোগিন-'এ। ধর্মনীতি ও শিল্পনীতি প্রসঙ্গেও কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন অরবিন্দ 'কর্মযোগিন পত্রিকায়।

ইংরাজী 'কর্মযোগিন' পত্রিকা বেশ জনসমাদর লাভ করলো বটে কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অশিক্ষিত পাঠকরা এর মর্মোদ্ধার করতে না পারার জন্যে মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করতে লাগলো। তারা 'কর্মযোগিন' অফিসে চিঠি লিখলো এই প্রকার আবেদন জানিয়ে যে এই পত্রিকার বাংলা সংস্করণ কি প্রকাশ করা সম্ভব নয়?

কর্মযোগিনের কর্মকর্তারা তাদের আবেদন প্রসঙ্গে চিন্তা করতে লাগলেন। অরবিন্দও চিন্তা করলেন।

শেষকালে ঈশ্বরগতপ্রাণ অরবিন্দের জীবনে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। উত্তরপাড়ার শ্রমজীবী সমবায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার

বিপ্লবীদের অন্যতম অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দের কাছে এসে বললেন, আমি 'কর্মযোগিন'-এর বাংলা সংস্করণ বের করার দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনি রাজী আছেন তো?

অরবিন্দ হাসিমুখে সম্মতি জানালেন।

দেখতে দেখতে হাওড়া কর্মযোগ প্রেস হতে 'কর্মযোগিন'-এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ হতে লাগলো। ইংরাজী কর্মযোগিনে অরবিন্দের যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা কর্মযোগিনে প্রকাশ করা হলো। এবার ইংরাজী-না-জানা জনসাধারণের মন অনেকটা শান্ত হলো।

এই সময় হাওড়া পিপলস্ এসোসিয়েসনে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে অরবিন্দ ইংরাজী ভাষায় এক সুন্দর বক্তৃতা দেন তার অংশবিশেষ বাংলায় উদ্ধৃত করছি ঃ

'প্রত্যেক স্বাধীন জাতির তিনটি মৌলিক অধিকার থাকবেই —সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতা করবার স্বাধীনতা আর সংঘ-বদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা। এই তিনটি অধিকারে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা কারও নেই। বাক্যের স্বাধীনতার ভেতর দিয়েই জাতি তার আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মধ্যেই এই স্বাধীনতা প্রতিফলিত। আর এই দু'রকম স্বাধীনতার পথেই দেখা দেয় পর পর মিলিত ঐক্যবদ্ধ হবার আকাঙ্খা ও অধিকার।... মানবসমাজে ঐক্যের অপেক্ষা শক্তিশালী জিনিষ আর কিছুই নেই— এর দ্বারাই মানবসমাজ পরিচালিত হয়ে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়।...ভারতবর্ষে আজ এই ঐক্য—এই সংঘবদ্ধতারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।'

ভারতের বিক্ষুব্ধ অবস্থা শান্ত করবার জন্যে বৃটিশ সরকার এক অভিনব ফন্দী আঁটলো। মিন্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারের একটি খসড়া তৈরী করলো বৃটিশ পার্লামেণ্ট। পরে সেটা পাঠিয়ে দিল ভারতে।

ভারতের মডারেটপন্থীরা ঐ শাসন-সংস্কার কিঞ্চিৎ রদবদল করে গ্রহণ করতে মনস্থ করলো। চরমপন্থী এবং বিপ্লবী অরবিন্দ এই সংস্কারকে আদৌ গ্রহণ করলেন না। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে কর্মযোগিন পত্রিকায় 'An open letter to my country-men' শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক হতে বলেন। তিনি লেখেন, 'এই ভুয়া সংস্কার গ্রহণ করলে দেশের প্রকৃতই ক্ষতি হবে। ইংরাজ এখন যা দিতে চাইছে তা পাকা গালাগালী ছাড়া আর কিছু নয়। কতকগুলি লোক এর দ্বারা প্ররোচিত হলেও চরমপন্থীরা এই সংস্কার কিছুতেই গ্রহণ করবে না।'

এই সময় বৃটিশ গোয়েন্দা তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করবার মুহূর্ত অন্বেষণ করছিল। তবু বিপ্লবী অরবিন্দ নির্ভীকচিত্তে নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন। পুলিশের ভয়ে আদৌ ভীত হলেন না।

অরবিন্দের লেখা এই চিঠিটি স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিখ্যাত দলিল হয়ে আছে। চিঠির আংশিক রূপ এখানে তুলে দিচ্ছি: 'এমন দুটি চূড়ান্ত ব্যাপার ঘটেছে যার ফলে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে নীরবতা ও প্রতীক্ষার ভাব পরিহার করা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আর একবার তাদের ন্যায্য স্থান গ্রহণ করা অবশ্য করণীয় হয়ে পড়েছে। যাবৎ শাসন-সংস্কারাবলীকে ভারতে গণতান্ত্রিক প্রগতির নবযুগের সূচনা বলে ঘোষণা করে জাহির করা হয়েছিল, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাগুলির নিয়মাবলী প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের সুবিবেচনার কাছে ওদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে — নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা নতুন ব্যবস্থাপক সভাগুলির অবিহার্য প্রকৃতি ও গঠন প্রকটিত হয়ে পড়েছে। একটি সংযুক্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভেতর মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদিদের মিলনের জন্যে মীমাংসার যে কথাবার্তা চলেছিল তা সফল হয়নি; মধ্যপন্থী দলের রাজনীতিক মত ও পথ জাতীয়তাবাদিদের স্বীকার করে নিতে হবে, মধ্যপন্থীরা এরূপ জেদ করায় আপসের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতে মধ্যপন্থী রাজনীতির পরিবর্তন নির্ভর করেছিল দু'টি বিষয় বস্তুর ওপরে—প্রতিশ্রুত শাসন-সংস্কারাবলীর অকৃত্রিমতা ও সাফল্য এবং জনসেবার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী দলের কর্মপ্রচেষ্টা কার্যত দাবিয়ে রেখে মধ্যপন্থী মজলিসের সভ্যদের যে সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়েছে তার প্রয়োগ, মধ্যপন্থা নীতির কার্যকারিতা ও মধ্যপন্থী দলের জীবন্ত শক্তি প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে তাঁদের জন্যে ক্ষেত্র পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। শাসন-সংস্কারাবলীতে সত্যসত্যই যদি নিয়মতান্ত্রিক প্রগতির প্রবর্তন হতো তাহলে ঘটনাগুলি হতে মধ্যপন্থী ক্রিয়া-কৌশল কতকটা সমর্থন পেতে পারতো। কিংবা জনগণের অধিকার লাভের জন্যে সংহত ও সবল আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা মধ্য-পন্থীদের আছে বলে কাজ দ্বারা তাঁরা যদি প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে, ক্রিয়া কৌশলের ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁরা রাজনীতির শক্তি হিসাবে তাঁদের ক্ষমতা ও সজীবতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন শাসন-সংস্কারাবলী আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে মধ্যপন্থা রাজনীতিতে অবিচলিত থেকে পশ্চাদ গমন নৈরাশ্য ও অবমাননা ছাড়া আর কিছুই আমরা আশা করতে পারি না গত বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে, মধ্যপন্থীরা (মডারেট) জাতীয়তা-বাদিগণের সহযোগিতা অনুকূলতা ভিন্ন বিরোধিতা করে এবং সবল আন্দোলন চালাতে একেবারেই অসমর্থ। তাঁদের নেতৃত্বে ভারতের রাজনৈতিক জীবন অবসন্ন ও নীরব হয়ে পড়েছে

'অভাবনীয় ঘটনাবলীর অকাট্য যুক্তির দ্বারা এ প্রতিপন্ন হয়েছে যে, আত্মশক্তি ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতিতে মধ্যপন্থী ও জাতীয়তা-বাদীর মিলন হয়েছিল বলেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিরাট আন্দোলন সাফল্য ও শক্তিলাভ করেছিল। সুরাটে বিচ্ছেদের পর এই প্রকার মিলনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগ-সুবিধা দেবার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদিরা হুগলীতে সম্মিলিত হয়েছিলেন; এবং সেই সম্মেলনের আর একটি উদ্দেশ্য এই ছিল যে; মীমাংসার কথা-

বার্তায় এমন কোন সূত্র ও পন্থা খুঁজে বের করা—যাতে উভয় দলই সংযুক্ত কর্মপ্রচেষ্টায় সম্মত হতে পারেন। মিলনের জন্যে আমরা হাত প্রসারিত করলেও মধ্যপন্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। মধ্যপন্থীদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা এবং জাতীয়তাবাদিদেরকে দমন করে রাখা হলো,—লর্ড মর্লির অনুসৃত নীতি। আর মিঃ গোখেল ও স্যর ফেরোজ সা মেটার নেতৃত্বে পরিচালিত মধ্যপন্থী দলের নীতি হলো—মর্লির নীতিকে নির্বিচারে অনুসরণ করে চলা এবং ওর সফলতার জন্যে পথ মুক্ত করে রাখা ও সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া। এই মিলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে ; মধ্যপন্থীরা যে ভিক্ষুকোচিত পুরস্কার পেয়েছেন তা তাঁদের দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নগণ্য ও ন্যূন জনপ্রিয় সদস্যদেব মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁদের রাজনীতিক মত ও নিয়মতন্ত্র গ্রহণের জন্যে জেদ প্রকাশের দ্বারা তাঁরা আপন দেশবাসীদের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ;. তাতে বোঝা যায় যে, তাঁদের অবলম্বিত পন্থার যাবতীয় উদ্দেশ্য এবং ওর সমর্থনযোগ্য রাজনীতিক কারণ লোপ পাওয়া সত্ত্বেও সেই পথ অনুসরণ করে চলাই মধ্য পন্থিদের অভিপ্রায়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত এবং অপমানিত হয়েও তাঁরা নিজেদের মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না ; কিংবা লর্ড মর্লির প্রদত্ত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে ভারতীয় জনগণকে তাঁরা বিভ্রান্ত করেছিলেন, ওদেরকেও কোন পরিষ্কার এবং যুক্তিসম্মত উপায় বলে দিতে পারছেন না :

'মধ্যপন্থী মজলিস দেশের জাতীয়তাবাদের বিপুলায়তন মনোভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, সংস্কারোত্তর ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্বাচক মণ্ডলীর ন্যায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নির্বাচন-মণ্ডলী গঠনের দ্বারা জনপ্রিয়তা ও শক্তিলাভের দ্বারগুলি ইচ্ছে করে বন্ধ করে দিয়েছে ; এবং যে নীতি দারুণ দুর্য্যোগের দিকে চালিত করেছে তাতেই অবিচলিত থেকে এ আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার করে রেখেছে ; ফলে অবসাদ এবং জনগণের ঔদাসীন্য অবজ্ঞা ও

বিরোধিতার দরুন এই মধ্যপন্থী মজ্‌লিসের ধ্বংস অনিবার্য। জাতীয়তাবাদিরা যদি এখন সরে পড়েন তবে হয় জাতীয় আন্দোলন লোপ পাবে, অথবা তাঁদের পরিত্যক্ত স্থান অন্যায় ও হিংসাত্মক কাজের দ্বারা পূর্ণ হবে। দেশের উন্নয়ন-প্রয়াসী ও মুক্তিকামী ব্যক্তিরা এই দু টি অবস্থার কোনটিই বরদাস্ত করতে পারবেন না।

'প্রতীক্ষা করবার কাল শেষ হয়ে গেছে। দুটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে রয়েছে। প্রথমত জাতির ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে আর দ্বিতীয়ত এ গড়ে তোলার জন্যে আমরা মধ্যপন্থী দলের কাছ থেকে কোন রকম আন্তরিক সহযোগিতা আশা করতে পারি না। আমাদের যা করণীয় তা আমাদেরকে নিজের শক্তি ও সাহসেই করতে হবে। তাহলে আসুন আমরা সাহসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের মতো এই ভগবদ্দত্ত কাজে আত্মনিয়োগ করি। আর কার্য-সাধনার্থ বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে ও মহাসংকটের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকি ; কেন না আমাদের ব্রতও মহান্। এমন কেউ যদি থাকেন যারা নির্যাতনের ভয়ে সাহস হারিয়েছেন তাঁরা একপাশে সরে থাকুন। এমন কেউ যদি থাকেন যাঁরা মনে করেন যে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান তোষামোদের দ্বারা কিংবা ইংরাজী উদারনীতিকতার সঙ্গে কপট প্রণয়ের অভিনয় করে প্রচেষ্টার আবশ্যকতা আর বিপদের অনিবার্যতা পরিহার করতে পারেন, তাঁরা এক পাশে সরে থাকুন। এমন কেউ যদি থাকেন যাঁরা অকিঞ্চিৎকর লাভ কিংবা অসার অনুগ্রহের দানে তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত, তাঁরা এক পাশে সরে থাকুন। কিন্তু যাঁরা জাতীয়তাবাদী নামে অভিহিত হবার যোগ্য তাঁদের সকলকে সাড়া দিতে হবে এবং নিজ নিজ কর্তব্যভার বহন করতে হবে।

'আইনের ভীতি তাদের জন্যেই যারা আইন ভঙ্গ করে। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ ও ন্যায়সঙ্গত, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয়, আমাদের পন্থা শান্তিপূর্ণ, কিন্তু অবিচলিত ও নির্ভীক। আমরা আইন ভঙ্গ করবো না, সুতরাং আইনকে আমাদের ভয় করবার কোন

দরকার নেই। কিন্তু কলুষিত পুলিশ, অবিবেকী রাজকর্মচারী কিংবা একদেশদর্শী বিচার-আদালত যদি অবৈধ রাজ-অনুজ্ঞা, উৎকোচ দানে সংগৃহীত মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা অন্যায় সিদ্ধান্তের দ্বারা পুরোবর্তী ব্যক্তিদেরকে হয়রান করবার জন্যে আমাদের রাজনীতিক কর্মধারার ন্যায়সঙ্গত প্রচারের সুবিধা গ্রহণ করেন—তাহলে স্বাধীনতার অভিধানে আমাদের অবশ্য দেয় শুল্ক প্রদান করতে আমরা কি সঙ্কুচিত হবো? আমরা কি তুচ্ছ গোপনীয়তা কিংবা অপমানজনক নিষ্ক্রিয়তার পেছনে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকবো? আমাদের সভাসমিতি, আমাদের সঙ্ঘ-সংস্থা আমাদের প্রচার-পদ্ধতি সমস্ত আমাদের রাখতেই হবে; আর যদি নিরঙ্কুশ ঘোষনাবলীর দ্বারা এই সব বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য আমরা সম্পাদন করলুম এবং সেই উন্মত্ততার কোন রকম দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তিবে না—যা ভারতের ভেতরে ও বাইরে আমাদের মধ্যে অভ্যুত্থিত ভয়ঙ্কর ভাবে উদ্যমশীল ও বিবেকহীন শক্তিসমূহের হাতের মধ্যে একটি হতাশ ও রুষ্ট নির্বাক জাতিকে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্য ও বৈধ রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টাকে নিষ্পেষিত করে দেয়। শান্তিপূর্ণ কর্ম-প্রচেষ্টার জন্যে কোন প্রকার সামান্য পথও যদি খোলা থাকে, তাহলে আমরা সংগ্রাম পরিহার করবো না। যদি অবস্থা সঙ্গীন ও প্রায় অসাধ্য করে তোলা হয় তবে ট্রানসভালে আমাদের দেশবাসীগণকে যে অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে তার চেয়েও কি তা অসহ্য হতে পারে? কিংবা আমরা—ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট অংশ—সেই শ্রমজীবী ও দোকানীদের অপেক্ষাও কি কম সামর্থ্য ও আত্মোৎসর্গ দেখাবো যারা স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ ও স্বজাতির মর্য্যাদার জন্যে সেখানে প্রসন্ন চিত্তে দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করছে?

'আমাদের প্রচেষ্টা কিসের জন্যে? পূর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশ আমাদের লক্ষ্য। অধিকতর দূরবর্তী লক্ষ্যে পৌছবার প্রাথমিক সোপান স্বরূপ।

আমাদেরকে ইত্যবসরে অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল অবস্থায় যেরূপ ত্রুটিপূর্ণ আত্মোন্নতি এবং অসম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ সম্ভব; তাই লাভ করতে হবে। আমরা যা চাচ্ছি তা এই যে আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলির ভেতর দিয়ে কিংবা দেশের আইনের দ্বারা আমাদের জন্যে প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে স্বায়ত্তশাসন বিবর্তিত করে তোলা। পরিচালন করবার মত কতক পরিমাণ শাসন-ক্ষমতা ছাড়া শেষোক্ত উপায়ে এরূপ বিবর্তন সম্ভব নয়। সুতরাং এই সদ্য-প্রবর্তিত কৃত্রিম পরিকল্পনা চাই না। কিন্তু আমরা চাই, লর্ড মর্লির শাসন সংস্কারাবলীতে যে গণতান্ত্রিক নীতি উপেক্ষিত হয়েছে সেই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা সংস্কার, ধর্ম জাতি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে গঠিত লেখাপড়া-জানা একটা নির্বাচক-মণ্ডলী, বর্জন-ক্ষমতাযুক্ত বিধান হতে মুক্ত স্বাধীনতা, আইন-প্রণয়ন ও আর্থিক ব্যাপারে এবং স্বৈরাচারী শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী-মণ্ডলকে কতকটা নিয়ন্ত্রণ করবার মতো কার্যকরী ক্ষমতা। সরকারী শাসন বিভাগকে আমলাতন্ত্রের হাত হতে জনগণের হাতে ক্রমশঃ হস্তান্তরিত করাও আমাদের দাবী। যে পর্যন্ত না এই সমস্ত দাবী পূরণ হয়, সে পর্যন্ত আমরা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে চাপ দেবো এবং এরই নাম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।' আমরা সেই চাপ দেবো আইনের সীমার মধ্যে থেকে। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার কথা বাদ দিলেও কতদূর পর্যন্ত আমরা এর প্রয়োগ করবো তা নির্ভর করে অবস্থানুযায়ী ঔচিত্যের ওপর এবং যে পরিমাণ প্রতিরোধ আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে তার ওপর।

'আমাদের নিজেদের পক্ষে সমাধান করার জন্যে বড় ও জরুরী সমস্যাগুলি রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা অবসন্ন হয়ে পড়েছে নৈতিক উদ্দীপনা ও আর্থিক সাহায্য না পেয়ে, এবং এরূপ বন্ধনমুক্ত বুদ্ধি-বৃত্তির অভাবে যা এর সংহতি ও পথের বিঘ্নগুলিকে অপসারিত করবার পক্ষে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ও নির্ভয়। যে সালিসের আন্দোলন প্রারম্ভে সফল

হয়েছিল তা নির্ষাতনের ফলে স্থগিত রাখা হয়েছে। স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনের আন্দোলন নিজের বলে আজ পর্য্যন্ত চলছে। কিন্তু অগ্রগতির এখন আর সেই দ্রুততা এবং বলিষ্ঠ সংকল্পের সঙ্গে অনিবার্যতা নেই যা ওকে সামনের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সামাজিক সমস্যাগুলি আমাদেরকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে আর এগুলিকে আমরা আর অবহেলা করতে পারি না। আমাদের দেশে গত শতাব্দীতে উপেক্ষিত জ্ঞানের সংগঠন-ভার আমাদেরকে অবশ্যই নিতে হবে। সর্বনাশা ব্যয়বহুল বৃটিশ আদালতে মামলাবাজির শয়তানী আশ্রয় হতে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনীতিক উন্নয়নকে নির্মুক্ত করতে হবে। শিল্পসম্পর্কিত স্বাধীনতা এবং অর্থনীতিক প্রাচুর্যের অভিমুখে আন্দোলনকে পরিচালিত করবার জন্যে আমাদেরকে আর একবার চেষ্টা করতে হবে।’

‘এইসব হলো আমাদের উদ্দেশ্য—যার জন্যে ভারতের জাতীয় শক্তিকে সংহত করা দরকার। আমাদের ওপরই কার্যভার ন্যস্ত হয়েছে, একমাত্র আমাদের মধ্যে সেই নৈতিক উৎসাহ বিশ্বাস ও ত্যাগের ইচ্ছা রয়েছে—যা কাজ সম্পাদনের জন্যে চেষ্টা করতে আর অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে পারে। এইজন্যে সবার আগে দরকার জাতীয় দলকে সংঘবদ্ধ করে তোলা। দেশের সমস্ত বৃহৎ কেন্দ্র-গুলিতে কার্যভার নেবার জন্যে আর জাতীয়তাবাদীদের কর্মতৎপরতা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উপায় নির্ধারনার্থ যেসব নেতা তাড়াতাড়ি সম্মিলিত হবেন তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমি সেই দলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। জাতীয়তাবাদিদের একটি পরিষদ স্থাপন আর আগামী বছরের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে দলের একটি সভার অধিবেশন বাঞ্ছনীয়। দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক। এই সব কাজ যখন সমাধা করবো তখনই আমরা আমাদের কার্যক্রম প্রস্তুত করে প্রকাশ করতে আর ভারতের রাজনীতিক জীবনে আমাদের উপযুক্ত জায়গায় বসাতে সমর্থ হবো।’

এই সময় কলকাতার কুমারটুলির এক জনসভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন কেন তিনি শাসন সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তিনি বললেন, '...এই শাসন সংস্কার নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। ভারতবাসীর স্বার্থ আর ইংরেজের স্বার্থ এক নয়—এমন অবস্থায় ইংরেজের অনুগ্রহের দানকে আমি সন্দেহের চোখে না দেখে পারি না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শাসকবর্গের হাতে রয়েছে, প্রস্তাবিত এই সংস্কার গৃহীত হলে তারা সেই ক্ষমতা ত্যাগ করবে। এই সংস্কার আমাদেরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে মাত্র।'

৭ই আগষ্টের আগেই তিনি এই বক্তৃতা দেন। তিনি নিস্তব্ধতা, গোখেলের পুণা-বক্তৃতা, গভর্ণমেণ্টের মডারেট তোষণ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দমননীতি, বয়কট আর ৭ই আগষ্ট জাতীয় উৎসব সম্বন্ধে বলেন। তারপর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে বলেন যে এ নৈতিক বলের ওপর ভিত্তি করে এমন এক বিপ্লব ও পরিবর্তন আনবে যা জগতের ইতিহাসে এর আগে আর দেখা যায়নি। 'passive resistance will bring a peaceful revolution based on moral force, unprecedented in history.'

বাংলায় 'কর্মযোগিন' পত্রিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার জনপ্রিয়তা গেল বেড়ে। এবার গিরিজাশঙ্কর স্থির করলেন অরবিন্দ-কে সম্পাদক রেখে 'ধর্ম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন। গিরিজাশঙ্কর হচ্ছেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ছোট ভাই। তিনি বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেত।

তিনি একদিন অরবিন্দকে জানালেন নিজের অভিপ্রায়, আমি একখানি বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। তার নাম দেবো 'ধর্ম'। আপনি তার সম্পাদক হলে ভাল হয়।

অরবিন্দ বললেন, আমি এতে রাজী আছি। এতে আমি বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখবো।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 'ধর্ম' আত্মপ্রকাশ করলো। পত্রিকার প্রথম পাতাতেই লেখা গীতার অমর বাণী—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত…।'

এই পত্রিকার মারফৎ বিপ্লবী ও ধর্মপ্রাণ অরবিন্দ বাঙালী জাতিকে ধর্মকে আশ্রয় করে আত্ম-উৎসর্গের মন্ত্র শুনিয়েছেন।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লিখলেন : 'আমাদের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা—জাতির একতা নেই, গতির স্থিরতা নেই,…অগ্রগামী, পশ্চাদ্‌গামী, বিপ্লববাদী, শান্তিপ্রিয়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়…তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গ উঠে, যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ তরঙ্গের চূড়ায় আরূঢ় তাঁহারা তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতেছেন, তরঙ্গ চালাইতেছেন না। সেই উদ্বেলিত শক্তিই বিপ্লবের একমাত্র নেতা ও কর্তা।…কয়েকজন ভাসমান নেতাকে আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রের গতলগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং উদ্ধত বায়ুস্থূলকে আইন-কানুন নিগড়াবদ্ধ গুহ্যগহ্বরে নিগৃহীত করিয়াছেন,…কিন্তু যে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গোল থামিবার নয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। …আমাদের দেশে এইরূপ নিয়ম পাঁচ বৎসর হইতে চলিতেছে। এই সময় অগ্রসর হইবার দিন নহে, আত্মরক্ষার দিন। যেন উদ্দাম আচরণে বিপক্ষকে সুযোগদান না করি, কিংবা ভীরুতা প্রকাশে নিগ্রহ নীতিকে সফল না করি।'…

অরবিন্দ 'ধর্ম' পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে নীরব কর্মী হবার উপদেশ শুনিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন, কর্মের মধ্যে নামের মোহ থাকলে চলবে না। বিনা সংযমে, বিনা সাধনায় যে কাজ শেষ হয় তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে।

এই কারণে তিনি দেশবাসীকে নামের মোহ ত্যাগ করে যথার্থ শক্তিসাধক হয়ে শক্তিপূজায় ব্রতী হতে বলেছেন।

নিয়মিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও অরবিন্দ কতকগুলি ধারাবাহিক রচনা 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেগুলি হচ্ছে 'কারাকাহিনী' 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'ক্ষমার আদর্শ,' 'জগন্নাথের রথ' এবং 'গীতার ভূমিকা'।

'ধর্ম' পত্রিকায় স্বাধীনতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখলেন : 'স্বাধীনতা আমাদের রাজনৈতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য কিন্তু স্বাধীনতা কি তাহা লইয়া মতভেদ বর্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলে, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুন্ন আনন্দকে স্বরাজ বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বরাজের একমাত্র অঙ্গ। তাহার দুই দিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীর শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয় ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।

'স্বাধীনতাই জীবনরক্ষা, স্বাধীনতাই উন্নতির সম্ভাবনা। পরের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই। ·· ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি বিনাসর্তে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শভ্রষ্ট ও স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে পারে বটে। ·কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুলমার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নই।'

'ধর্ম' পত্রিকায় 'আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়' প্রবন্ধে লিখলেন অরবিন্দ : '··আজ পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা আর্য্য শিক্ষা বলি, তাহা প্রাচ্য সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয় জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তির নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল

আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্য্য শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তিমার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, এখনও স্রোত নির্ম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

'...যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্ব্বরোচিত গুণ ; মনুষ্য-উন্নতির ক্রম-বিকাশে যে সকল গুণ অল্পে অল্পে বর্জ্জিত হইতেছে, এই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একটি বিঘ্নকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্বিক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের অমঙ্গল সাধিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।'...

'বন্দে মাতরম্', 'কর্মযোগিন' এবং 'ধর্ম' এই পত্রিকায় অরবিন্দের রচনার মর্মবাণী মূলতঃ একই রকম, যদিও বাহ্যতঃ ছিল ভিন্ন প্রকারের। তিনি জাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার উপযোগী করে গড়ে তোলবার

পরিকল্পনা এই তিনটি পত্রিকার মাধ্যমে দিয়ে গেছেন যার প্রতিফলন আমরা পেয়েছি গান্ধীযুগে এবং তার পরবর্তীকালে। ভারতীয় রাজনীতি ইউরোপীয় রাজনীতির মত তত্ত্বনির্ভর নয়, এ হচ্ছে একান্ত প্রাণের বস্তু এবং ধর্মকেন্দ্রিক পবিত্র পুষ্প।

'কর্মযোগিন' পত্রিকার মত বাংলা ভাষায় প্রচারিত 'ধর্ম' পত্রিকার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে লাগলো। এই সময় কংগ্রেসের মডারেট-পন্থীদের সুর খানিকটা নরম হয়ে এলো। তাঁদের মুখে সহযোগিতার কথা শোনা গেল মডারেটপন্থী নেতা মিঃ গোখেলের মুখেই প্রথম শোনা গেল। এই ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় 'দেশবাসীর প্রতি আমার খোলা চিঠি' নামক প্রবন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। পরে ১৯০৯ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতায় বললেন, 'বিলেতে কার্জন উইলির হত্যার কথা উল্লেখ করে ছোট লাট বাহাদুর শাসিয়েছেন যে ভারতবর্ষের লোকেরা যদি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা না করে চলে তাহলে গভর্ণমেণ্টের তরফ হতে এই দেশ-বাসীর ওপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হবে।

অরবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় এর উত্তর দেন। তিনি বললেন, (১) গভর্ণমেণ্ট ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করলে সন্ত্রাসবাদও ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে যাবে, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

(২) সভাসমিতি ও সংবাদপত্র ইত্যাদির স্বাধীনতারূপ জাতির প্রাথমিক অধিকার যদি গভর্ণমেণ্ট স্বীকার না করেন তাহলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালানো যেতে পারে না।

(৩) আর, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাবার পথ যদি গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করে দেন তবে সন্ত্রাসবাদ অতি ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

(৪) মিঃ গোখেল তাঁর পুণা বক্তৃতায় বলেছেন যে—শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যাবে

না। এর ফলে সন্ত্রাসবাদিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ত্রাসবাদ চালাতে আরম্ভ করবেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর। হাইকোর্টের আলিপুর বোমার মামলার রায় বের হলো। এই মামলার অন্যতম বিচারক ছিলেন মিঃ জেনকিন্স্। অরবিন্দ তাঁর বিচারের ওপর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় বিশেষ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করে ইংরাজ সরকার তাঁর ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ভেতর ভেতর তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

এর কিছুকাল পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় 'বর্তমান অবস্থা' নামে অরবিন্দের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ইংরাজ সরকারের নজরে রাজদ্রোহমূলক বলে মনে হলো। বিপ্লবী অরবিন্দের ওপর এবার তীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি এসে পড়লো বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশের।

এরপর আর একটি ঘটনা ঘটে গেল যার জন্যে অরবিন্দের ওপর ইংরাজ পুলিশের রোষবহ্নি দ্বিগুণ মাত্রায় ঝরে পড়লো। সেটি হচ্ছে এই যে, সরকার পক্ষ থেকে আলিপুর বোমার মামলায় তদ্বির-তদারক করার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর মৌলভী সামসুল আলাম।

হঠাৎ তাঁর পদোন্নতি হলো। তিনি হলেন ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ। মামলার কাজে তাঁকে প্রায়ই হাইকোর্টে আসতে হতো।

সেদিন ছিল ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী। মৌলভী সামসুল আলাম এসেছেন হাইকোর্টে সরকারী কাজে।

কাজ শেষ হলে তিনি বাড়ী যাবার জন্যে হাইকোর্টের সিঁড়ি থেকে নামছেন এমন সময় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের রিভলভারের গুলিতে প্রাণ হারান।

অরবিন্দ এই হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। বৃটিশ সরকার এই প্রবন্ধ পড়ে অরবিন্দের ওপর ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের মত ক্ষিপ্ত হলেন।

তবু নির্ভীক অরবিন্দ বৃটিশ সরকারের ভ্রূকুটিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বীরের মত নিয়মিত ভাবে 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন।

ওদিকে মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কারের প্রস্তাব এদেশে এসে পৌঁছলো। বৃটিশ সরকার এখন ভারতবাসীদের প্রতি একটু নরম ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। নির্বাসিত নেতাদের মুক্তি দেওয়া হলো।

শ্যামসুন্দর 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রিকাব সহ-সম্পাদক রূপে সম্পাদনের ভার দিলেন। কিন্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক মতি-লাল ঘোষের অনুরোধে তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' যোগ দেন। অবসর সময়ে 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ লিখতেন।

দেশে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকা বেড়েই চলেছে। অরবিন্দও 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় বিভিন্ন জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন।

একদিন ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দেব কাছে অর্থাৎ 'কর্মযোগিন' পত্রিকার অফিসে এসে বললেন, আপনাকে বৃটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আপনি দু'এক দিনের মধ্যে এখান থেকে কোন এক গোপন জায়গায় চলে যান।

অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার কথা শুনলেন। তাকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে কলকাতা পরিত্যাগ করতে মনস্থ করলেন।

অবশেষে তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্যামপুকুরের 'কর্মযোগিন' পত্রিকা অফিস ত্যাগ করে চললেন অজানা দেশের দিকে। তাঁর সঙ্গী হলেন সুরেশ চক্রবর্তী, বিজয় নাগ, রামচন্দ্র মজুমদার, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। যাবার আগে ভগিনী

নিবেদিতার হাতে 'কর্মযোগিন' পত্রিকার পরিচালন-ভার ন্যস্ত করে যান।

শ্যামপুকুর হতে দক্ষিণেশ্বরে এলেন অরবিন্দ। দক্ষিণেশ্বরে তখন অবস্থান করছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদামণি।

অরবিন্দ মায়ের কাছে গেলেন আশীর্বাদ নিতে। শ্রীমা তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। সেই সঙ্গে অরবিন্দকে দেখে মন্তব্য করলেন, 'এইটুকু মানুষ—এঁকেই গভর্ণমেণ্টের এত ভয়?'

এরপর অরবিন্দের কাছে এসে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি আমার বীর ছেলে।

শ্রীমার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন গৌরী-মা। তিনি অরবিন্দের চিবুক ধরে স্বামীজীর কবিতা উদ্ধৃত করে বললেন: 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়

হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমার আশীর্বাদ ও পদধূলি নিয়ে অরবিন্দ নৌকা-যোগে যাত্রা করলেন চন্দননগরের উদ্দেশ্যে।

চন্দননগরে এসে তিনি মতিলাল রায়ের বাড়ীতে গুপ্তভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। এখানে অজ্ঞাতবাসে বেশ কিছু দিন কাটিয়ে দিলেন। এখানে থাকার সময় তিনি লিখলেন "yoga and its object'.

এরপর এলো ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৮ঠা এপ্রিল। এই পুণ্যদিনে অন্তরের বাণীর নির্দেশে অরবিন্দ ছদ্মনামে চন্দননগর ত্যাগ করে ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থান পণ্ডিচেরী অভিমুখে রওনা হলেন।

প্রথম চার বছর অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অরবিন্দের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তিনি পণ্ডিচেরীতে গুপ্তভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। এর মধ্যে দেশে অনেক অঘটন

ঘটে গেল। বৃটিশ সরকার ভাঙ্গা বাংলা আবার জুড়ে দিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ নিজে ভারতবর্ষে এসে এই কাজ করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে চলে আসে দিল্লীতে। নতুন রাজধানীতে প্রবেশ করার সময় বিপ্লবীরা বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমার মুখে অভ্যর্থনা জানালো। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের ছোট-বড় ঘটনা ঘটে চললো। অরবিন্দ এসব খবর রাখতেন কিনা বলা শক্ত; কারণ তিনি তখন অজ্ঞাতবাসে কাল কাটাচ্ছিলেন।

পরে চার বছরের মাথায় তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন 'আর্য্য' নামে নতুন এক পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকায় তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক বিদ্যা প্রসঙ্গে রচনা লিখতে লাগলেন। এই পত্রিকায় গীতা, উপনিষদ, দিব্যজীবন প্রভৃতি বিষয়ে বহু লেখা ছাপা হলো।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত পল রিসার সাধু অন্বেষণ করতে করতে ভারতে এসে উপস্থিত হন। পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে এসে অরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করে 'আর্য্য' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন। পরে ইউরোপে ফিরে গিয়ে লিখলেন: 'পৃথিবীর সর্বত্র আমি অনেক সাধু দেখেছি। এবার পণ্ডিচেরীতে এসে আমি প্রকৃত সাধুর সন্ধান পেলুম।'

এই পল রিসারের স্ত্রী মিসেস মীরা রিসার পরে অরবিন্দ আশ্রমে এসে অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নেন এবং আশ্রমে অবস্থান করে আশ্রম পরিচালনার সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কালে ইনি শ্রীমা নামে লোকসাধারণের কাছে পরিচিত হন। এখনো শত শত ভারতবাসী তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখায়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী রাঁচিতে পিত্রালয়ে দেহত্যাগ করেন।

দীর্ঘ ৪০ বছর পণ্ডিচেরী আশ্রমে অবস্থান করেন অরবিন্দ।

এই সুদীর্ঘ সময় তিনি কেবল নিজের যোগজীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নি। তাঁর যোগসাধনা বিশ্বের কল্যাণের জন্যে করে গেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনার দ্বারা উর্দ্ধস্তরে উঠতে পারে এবং যোগের পথে ঠিক ঠিক ভাবে চলতে পারলে দেবত্ব বা দিব্য জীবনের অধিকারী হতে পারে।

পণ্ডিচেরীতে চলে যাবার পর অরবিন্দ আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফিরে আসেননি। বাংলাদেশ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বারীন্দ্র কুমার প্রমুখ নেতারা অরবিন্দের কাছে প্রস্তাব করেন যেন তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশে ফিরে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন।

অরবিন্দ তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি আশ্রমে থেকেই দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং এখন থেকে তিনি লোকসাধারণের সান্নিধ্যে আসা প্রায় বন্ধ করে দেন। বছরে তিনটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি সকলকে দেখা দিতেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে যান। তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন সেই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শৃন্বন্তু বিশ্বে।'

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ক্রীপস্ মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্যে অরবিন্দ কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন। বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবার জন্যে ক্রীপস্ মিশনকে ভারতে পাঠান। তাঁরা বললেন, ভারতবাসী যদি বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করে তাহলে যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে অখণ্ড স্বাধীনতা দান করবে।

ভারতীয় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করলো।

এরপর এলো .৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা